ধর্ম্মবিজ্ঞান।

স্বামী বিবেকানন্দ।

মাঘ, ১৩১৬।

[মূল্য ১৲ এক টাকা]

অনুবাদকের নিবেদন।

এই গ্রন্থখানি উদ্বোধন আফিস হইতে প্রকাশিত The Science and Philosophy of Religion নামক পুস্তকের সমগ্র বঙ্গানুবাদ। ইহার অন্তর্গত বক্তৃতাগুলি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে নিউইয়র্কে একটী ক্ষুদ্র ক্লাসের সমক্ষে প্রদত্ত হয়। ঐগুলি তখনই সাঙ্কেতিক লিপি দ্বারা গৃহীত হইয়া রক্ষিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু অতি অল্পদিন মাত্র 'জ্ঞানযোগ—২য় ভাগ' নামে আমেরিকা হইতে প্রকাশিত হয়। তাহারও কিছু পরে উহা স্বামী সারদানন্দ কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়া উদ্বোধন আফিস হইতে বাহির হয়। এতদিন উদ্বোধনে উহার বঙ্গানুবাদ ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছিল। এক্ষণে উৎকৃষ্ট কাগজে ও বড় অক্ষরে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল।

এই গ্রন্থে সাংখ্য ও বেদান্তমত বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে, উভয়ের মধ্যে কোন্ কোন্ স্থানে ঐক্য ও কোন্ কোন্ বিষয়েই বা অনৈক্য, তাহা উত্তমরূপে প্রদর্শন করা হইয়াছে আর বেদান্ত যে সাংখ্যেরই চরম পরিণতি, ইহা প্রতিপাদিত করা হইয়াছে। ধর্ম্মের মূল তত্ত্বসমূহ—যেগুলি না বুঝিলে ধর্ম্ম জিনিষটাকেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না—আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত মিলাইয়া এই গ্রন্থে আলোচিত হওয়াতে গ্রন্থের 'ধর্ম্মবিজ্ঞান' নামকরণ বোধ হয় অনুচিত হয় নাই। অনুবাদ মূলানুযায়ী অথচ সুবোধ্য করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। যে সকল স্থানে সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে কিছু উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহারই মূল পাদটীকায় দেওয়া হইয়াছে। তবে স্থানে স্থানে ঐ সকল উদ্ধৃতাং-

শের অনুবাদ যথাযথ নহে—সেই সকল স্থলে প্রায় কোন্ গ্রন্থের কোন্ স্থান অবলম্বনে ঐ অংশ লিখিত হইয়াছে, পাদটীকায় তাহার উল্লেখমাত্র করা হইয়াছে। কয়েকটী স্থলে স্বামীজির লেখায় আপাততঃ অসঙ্গতি বোধ হয়—অনুবাদে সেই স্থলগুলির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন না করিয়া অনুবাদকের বুদ্ধি অনুযায়ী পাদটিকায় উহাদের সামঞ্জস্যের চেষ্টা করা হইয়াছে। অন্যান্য কয়েকটী আবশ্যকীয় পাদটিকাও প্রদত্ত হইয়াছে।

দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক শব্দসকলের সকল স্থলে বঙ্গানুবাদ কঠিন। যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞতার জন্য যাঁহারা স্বামীজির ইংরাজী মূলগ্রন্থ পড়িতে অক্ষম, এইরূপ একজনকেও স্বামীজির অপূর্ব্ব উপদেশামৃতের এককণা পানের সাহায্য করিতে পারিয়া থাকিলেও নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব। ইতি

বিনীতানুবাদকস্য।

সূচীপত্র।

বিষয়				পৃষ্ঠা।

Swami Vivekananda.
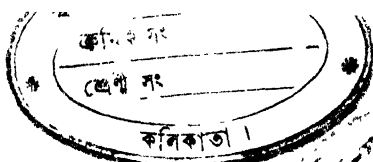
ধর্ম্মবিজ্ঞান।

(সাংখ্য ও বেদান্তমতের সমালোচনা।)

সূচনা।

আমাদের এই জগৎ—এই পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ—এই জগৎ যাহার তত্ত্ব আমরা যুক্তি ও বুদ্ধিবলে বুঝিতে পারি—উহার উভয় দিকেই অনন্ত, উভয় দিকেই অজ্ঞেয়, চির-অজ্ঞাত বিরাজমান। যে জ্ঞানালোক জগতে ধর্ম্ম নামে পরিচিত, তাহার তত্ত্ব এই জগতেই অনুসন্ধান করিতে হয়; যে সকল বিষয়ের আলোচনায় ধর্ম্মলাভ হয়, সেগুলি এই জগতেরই ঘটনা। স্বরূপতঃ কিন্তু ধর্ম্ম অতীন্দ্রিয় ভূমির অধিকার-ভুক্ত, ইন্দ্রিয়-রাজ্যের নহে। উহা সর্ব্বপ্রকার যুক্তিরও অতীত, সুতরাং উহা বুদ্ধির রাজ্যেরও অধিকারভুক্ত নহে। উহা দিব্যদর্শন-স্বরূপ, উহা মানবমনে ঈশ্বরীয় অলৌকিক প্রভাবস্বরূপ, অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়ের সমুদ্রে ঝম্পপ্রদান, উহাতে অজ্ঞেয়কে জ্ঞাত অপেক্ষা আমাদের অধিক পরিচিত করিয়া দেয়, কারণ, উহা কখন 'জ্ঞাত' হইতে পারে না। আমার বিশ্বাস, মানব-সমাজের প্রারম্ভ হইতেই মানবমনে এই ধর্ম্মতত্ত্বের অনুসন্ধান চলিয়াছে। জগতের ইতিহাসে এমন সময় কখনই হয় নাই, যখন মানব-যুক্তি ও মানব-বুদ্ধি এই জগতের

পারের বস্তুর জন্য অনুসন্ধান, উহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা না করিয়াছে।

আমাদের ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে—এই মানব-মনে—আমরা দেখিতে পাই, একটী চিন্তার উদয় হইল। কোথা হইতে উহা উদয় হইল, তাহা আমরা জানি না; আর যখন উহা তিরোহিত হইল, তখন উহা যে কোথায় গেল, আমরা তাহাও জানি না। বহির্জ্জগৎ ও অন্তর্জ্জগৎ যেন একই রাস্তায় চলিয়াছে, এক প্রকার অবস্থার ভিতর দিয়া উভয়কেই যেন চলিতে হইতেছে, উভয়ই যেন এক সুরে বাজিতেছে।

এই বক্তৃতাসমূহে আমি আপনাদের নিকট হিন্দুদের এই মত ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব যে, ধর্ম্ম মানুষের ভিতর হইতেই উৎপন্ন, উহা বাহিরের কিছু হইতে হয় নাই। আমার বিশ্বাস, ধর্ম্মচিন্তা মানবের প্রকৃতিগত; উহা মানুষের স্বভাবের সহিত এমন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত যে, যতদিন না সে নিজ দেহমনকে ত্যাগ করিতে পারে, যতদিন না সে চিন্তা ও জীবন ত্যাগ করিতে পারে, ততদিন তাহার পক্ষে ধর্ম্মত্যাগ অসম্ভব। যতদিন মানবের চিন্তাশক্তি থাকিবে, ততদিন এই চেষ্টাও চলিবে এবং ততদিন কোন না কোন আকারে তাহার ধর্ম্ম থাকিবেই থাকিবে। এই জন্যই আমরা জগতে নানা প্রকারের ধর্ম্ম দেখিতে পাই। অবশ্য ইহার চর্চ্চা ও আলোচনায় মাথা গুলাইয়া যাইতে পারে, কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকে যেমন ইহাকে বৃথা কল্পনামাত্র মনে করেন, ইহাকে তদ্রূপ বলিতে পারা যায় না। নানা আপাতবিরোধী

বিভিন্ন ধর্ম্মরূপ বিশৃঙ্খলতার ভিতর সামঞ্জস্য আছে, এই সব বেসুর, বেতালার মধ্যেও ঐক্যতান আছে; যিনি উহা শুনিতে প্রস্তুত, তিনিই সেই সুর শুনিতে পাইবেন।

বর্ত্তমান কালে সকল প্রশ্নের মধ্যে প্রধান প্রশ্ন এই,—মানিলাম—জ্ঞাত ও জ্ঞেয়ের উভয় দিকেই অজ্ঞেয় ও অনন্ত অজ্ঞাত রহিয়াছে—কিন্তু ঐ অনন্ত অজ্ঞাতকে জানিবার চেষ্টা কেন? কেন আমরা জ্ঞাতকে লইয়াই সন্তুষ্ট না হই? কেন আমরা ভোজন, পান ও সমাজের কিছু কল্যাণ করিয়াই সন্তুষ্ট না থাকি? এই ভাবই আজকাল চারিদিকে শুনিতে পাওয়া যায়। খুব বড় বড় বিদ্বান্ অধ্যাপক হইতে অনর্গল বৃথাবাক্যব্যয়কারী শিশুর মুখেও আমরা আজকাল শুনিয়া থাকি—জগতের উপকার কর—ইহাই একমাত্র ধর্ম্ম, জগতের অতীত সত্তার সমস্যা লইয়া নাড়াচাড়া করায় কোন ফল নাই। এই ভাবটী এখন এতদূর প্রবল হইয়াছে যে, ইহা একটা স্বতঃসিদ্ধ সত্যস্বরূপে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেই জগদতীত সত্তার তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া থাকিবার আমাদের যো নাই। এই বর্ত্তমান ব্যক্ত জগৎ সেই অব্যক্তের এক অংশমাত্র। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ানুভূত জগৎ যেন সেই অনন্ত আধ্যাত্মিক জগতের একটী ক্ষুদ্র অংশস্বরূপ, আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির ভূমিতে আসিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং ঐ অতীত জগৎকে না জানিলে কিরূপে উহার এই ক্ষুদ্র প্রকাশের ব্যাখ্যা হইতে পারে, উহাকে বুঝা যাইতে পারে? কথিত আছে, সক্রেটিস্ একদিন এথেন্সে বক্তৃতা করিতেছিলেন, এমন সময়ে [illegible]

সহিত এক ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হয়—ইনি ভারত হইতে গ্রীসদেশে গিয়াছিলেন। সক্রেটীস্ সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন, মানুষকে জানাই মানবজাতির সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তব্য—মানবই মানবের সর্ব্বোচ্চ আলোচনার বস্তু। ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর দিলেন, "ঈশ্বরকে যতক্ষণ না জানিতেছেন, ততক্ষণ মানুষকে কিরূপে জানিবেন?" এই ঈশ্বর, এই অনন্ত অজ্ঞাত বা নিরপেক্ষ সত্তা বা অনন্ত বা নামাতীত বস্তু—তাঁহাকে যে নাম ইচ্ছা তাহাই বলিয়া ডাকা যায়—এই বর্ত্তমান জীবনের, যাহা কিছু জ্ঞাত ও যাহা কিছু জ্ঞেয়, সকলেরই একমাত্র যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যাস্বরূপ। যে কোন বস্তুর কথা—সম্পূর্ণ জড়বস্তুর কথা—ধরুন। কেবল জড়তত্ত্বসম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের মধ্যে যে কোন একটী, যথা—রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিতজ্যোতিষ বা প্রাণিতত্ত্ববিদ্যার কথা ধরুন—উহা বিশেষ করিয়া আলোচনা করুন, ক্রমশঃ ঐ তত্ত্বানুসন্ধান অগ্রসর হউক, দেখিবেন—স্থূল ক্রমশঃ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর পদার্থে লয় হইতেছে—শেষে আপনাকে এমন স্থানে আসিতে হইবে, যেখানে এই সমুদয় জড়বস্তু ছাড়িয়া লাফ দিয়া অজড়ে যাইতেই হইবে। সকল বিদ্যায়ই স্থূল ক্রমশঃ সূক্ষ্মে মিলাইয়া যায়, পদার্থবিদ্যা দর্শনে গিয়া পর্য্যবসিত হয়।

এইরূপে মানুষকে বাধ্য হইয়া জগদতীত সত্তার আলোচনায় নামিতে হয়। যদি আমরা উহাকে জানিতে না পারি, তবে জীবন মরুভূমি হইবে, মানবজীবন বৃথা হইবে। এ কথা বলিতে ভাল যে, বর্ত্তমানে যাহা দেখিতেছ, সে সকল লইয়াই তৃপ্ত থাক;

গো, কুক্কুর ও অন্যান্য পশুগণ এইরূপ বর্ত্তমান লইয়াই সন্তুষ্ট, আর তাহাতেই তাহাদিগকে পশু করিয়াছে। অতএব যদি মানব বর্ত্তমান লইয়া সন্তুষ্ট থাকে এবং জগদতীত সত্তার সমুদয় অনুসন্ধান একেবারে পরিত্যাগ করে, তবে মানবজাতিকে পশুর ভূমিতে পুনরাবৃত্ত হইতে হইবে। ধর্ম্ম—জগদতীত সত্তার অনুসন্ধানই—মানুষ ও পশুতে প্রভেদ করিয়া থাকে। এ কথাটী অতি সুন্দর কথা যে, সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষই স্বভাবতঃ উপরের দিকে চাহিয়া দেখে; আর সকল জন্তুই স্বভাবতঃ নীচের দিকে ঝুঁকিয়া থাকে। এই ঊর্দ্ধদৃষ্টি, ঊর্দ্ধদিকে গমন ও পূর্ণত্বের অনুসন্ধানকেই 'পরিত্রাণ' বা 'উদ্ধার' বলে, আর যখনই মানব উচ্চতর দিকে গমন করিতে আরম্ভ করে, তখনই সে এই পরিত্রাণ-স্বরূপ সত্যের ধারণার দিকে আপনাকে অগ্রসর করে। পরিত্রাণ—অর্থ, বেশভূষা বা গৃহের উপর নির্ভর করে না, উহা মানবের মস্তিষ্কস্থ আধ্যাত্মিক ভাব-রত্নরাজির তারতম্যের উপর নির্ভর করে। উহাতেই মানবজাতির উন্নতি, উহাই ভৌতিক ও মানসিক সর্ব্ববিধ উন্নতির মূল; ঐ প্ররোচক শক্তিবলে, ঐ উৎসাহ-বলেই মানবজাতি সম্মুখে অগ্রসর হইয়া থাকে।

ধর্ম্ম প্রচুর অন্নপানে নাই, অথবা সুরম্য হর্ম্ম্যেও নাই। বারম্বার ধর্ম্মের বিরুদ্ধে আপনারা এই আপত্তি শুনিতে পাইবেন, "ধর্ম্মের দ্বারা কি উপকার হইতে পারে? উহা কি দরিদ্রের দারিদ্র্য দূর করিতে পারে?" মনে করুন, উহা যেন, তাহা পারে না, তাহা হইলেই কি ধর্ম্ম অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল? মনে

করুন, আপনি একটী জ্যোতিষিক সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন—একটী শিশু দাঁড়াইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসিল, "ইহাতে কি মিঠাই পাওয়া যায় ?" আপনি উত্তর দিলেন—"না, ইহাতে মিঠাই পাওয়া যায় না।" তখন শিশুটী বলিয়া উঠিল, "তবে ইহা কোন কাযের নয়।" শিশুরা তাহাদের নিজেদের দৃষ্টি হইতে অর্থাৎ কোন্ জিনিষে কত মিঠাই পাওয়া যায়, এই হিসাবে সমগ্র জগতের বিচার করিয়া থাকে। যাহারা অজ্ঞানাচ্ছন্ন বলিয়া শিশুসদৃশ, জগতের সেই সকল শিশুদের বিচারও তদ্রূপ। নিম্ন জিনিষের দৃষ্টিতে উচ্চতর জিনিষের বিচার করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। প্রত্যেক বিষয়ই তাহার নিজ নিজ ওজনে বিচার করিতে হইবে। অনন্তকে অনন্তের ওজনে বিচার করিতে হইবে। ধর্ম্ম মানবজীবনের সর্ব্বাংশ, শুধু বর্ত্তমান নহে,—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—সর্ব্বাংশব্যাপী। অতএব ইহা অনন্ত আত্মা ও অনন্ত ঈশ্বরের ভিতর অনন্ত সম্বন্ধস্বরূপ। অতএব ক্ষণিক মানবজীবনের উপর উহার কার্য্য দেখিয়া উহার মূল্য বিচার করা কি ন্যায়-সঙ্গত ?—কখনই নহে। এ সকল ত গেল, ধর্ম্মের দ্বারা এই এই হয় না, এই বিচারের কথা।

এখন প্রশ্ন আসিতেছে, ধর্ম্মের দ্বারা কি প্রকৃত পক্ষে কোন ফল হয় ? হাঁ, হয়। উহাতে মানব অনন্ত জীবন লাভ করে। মানুষ বর্ত্তমানে যাহা, তাহা এই ধর্ম্মের শক্তিতেই হইয়াছে, আর উহাতেই এই মনুষ্য নামক প্রাণীকে দেবতা করিবে। ধর্ম্ম ইহাই করিতে সমর্থ। মানবসমাজ হইতে ধর্ম্মকে বাদ দাও—কি অব-

শিষ্ট থাকিবে? তাহা হইলে সংসার শ্বাপদসমাকীর্ণ অরণ্য হইয়া যাইবে। ইন্দ্রিয়সুখ মানবজীবনের লক্ষ্য নহে, জ্ঞানই সমুদয় প্রাণীর লক্ষ্য। আমরা দেখিতে পাই, পশুগণ ইন্দ্রিয়সুখে যতদূর প্রীতি অনুভব করে, মানব বুদ্ধিশক্তির পরিচালনা করিয়া তদপেক্ষা অধিক সুখ অনুভব করিয়া থাকে; আর ইহাও আমরা দেখিতে পাই, বুদ্ধি ও বিচারশক্তির পরিচালনা হইতেও মানব আধ্যাত্মিক সুখে অধিকতর সুখবোধ করিয়া থাকে। অতএব অধ্যাত্মজ্ঞানকে নিশ্চিতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলিতে হইবে। এই জ্ঞানলাভ হইলেই সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ আসিবে। এই জগতের এই সকল বস্তু সেই প্রকৃত জ্ঞান ও আনন্দের ছায়ামাত্র—উহার তিন চার ধাপ নিম্নের প্রকাশ মাত্র।

আর একটী প্রশ্ন আছে ঃ—আমাদের চরম লক্ষ্য কি? আজকাল ইহা কথিত হইয়া থাকে যে, মানব অনন্ত উন্নতিপথে চলিয়াছে—সে ক্রমাগত সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু তাহার লাভ করিবার কোন চরম লক্ষ্য নাই। এই "ক্রমাগত সমীপবর্ত্তী হওয়া অথচ কখনই লাভ না করা" ইহার অর্থ যাহাই হউক, আর এ তত্ত্ব যতই অদ্ভুত হউক, ইহা যে অসম্ভব, তাহা অতি সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। সরল রেখায় কি কখন কোন প্রকার গতি হইতে পারে? একটী সরল রেখাকে অনন্ত প্রসারিত করিলে উহা একটী বৃত্তরূপে পরিণত হয়; উহা যেখান হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তথায়ই আবার ফিরিয়া যায়। যেখান হইতে আরম্ভ করিয়াছি, তথায়ই অবশ্যই শেষ করিতে হইবে; আর যখন ঈশ্বর হইতে

আপনাদের গতি আরম্ভ হইয়াছে, তখন ঈশ্বরেই অবশ্য প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। তবে ইতিমধ্যে আর করিবার কি থাকে? ঐ অবস্থায় পঁহুছিবার উপযোগী বিশেষ বিশেষ খুঁটিনাটি কার্য্যগুলি করিতে হয়—অনন্ত কাল ধরিয়া ইহা করিতে হয়।

আর একটি প্রশ্ন আসিতেছে—আমরা উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে হইতে কি ধর্ম্মের নূতন নূতন সত্য আবিষ্কার করিব না? হাঁও বটে, নাও বটে। প্রথমতঃ, এইটী বুঝিতে হইবে যে, ধর্ম্মসম্বন্ধে অধিক আর কিছু জানিবার নাই, সবই জানা হইয়া গিয়াছে। জগতের সকল ধর্ম্মেই আপনারা দেখিবেন, তদ্ধর্ম্মাবলম্বীরা বলিয়া থাকেন, আমাদের ভিতর একটী একত্ব আছে। সুতরাং ঈশ্বরের সহিত আত্মার একত্ব জ্ঞান হইতে, আর অধিক উন্নতি হইতে পারে না। জ্ঞান অর্থে এই একত্ব আবিষ্কার। আমি আপনাদিগকে নরনারীরূপে পৃথক্ দেখিতেছি—ইহাই বহুত্ব। যখন আমি ঐ দুই ভাবকেই একত্র দৃষ্টি করি এবং আপনাদিগকে কেবল মানবজাতি বলিয়া অভিহিত করি, তখন উহা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হইল। উদাহরণস্বরূপ রসায়ন শাস্ত্রের কথা ধরুন। রাসায়নিকেরা সর্ব্বপ্রকার জ্ঞাত বস্তুকে তাহাদের মূল ধাতুতে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, আর যদি সম্ভব হয়, তবে যে এক ধাতু হইতে ঐ সকলই উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এমন সময় আসিতে পারে, যখন তাঁহারা সকল ধাতুর মূলীভূত এক ধাতু আবিষ্কার করিবেন। যদি ঐ অবস্থায় কখন তাঁহারা উপস্থিত হন, তখন তাঁহারা তাহার উপরে

আর অগ্রসর হইতে পারিবেন না; তখন রসায়ন বিদ্যা সম্পূর্ণ হইবে। ধর্ম্মবিজ্ঞান-সম্বন্ধেও ঐ কথা। যদি আমরা পূর্ণ একত্বকে আবিষ্কার করিতে পারি, তবে তাহার উপর আর উন্নতি হইতে পারে না।

তার পরের প্রশ্ন এই, এইরূপ একত্ব লাভ কি সম্ভব? ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতেই ধর্ম্ম ও দর্শনের বিজ্ঞান আবিষ্কারের চেষ্টা হইয়াছে; কারণ, পাশ্চাত্যদেশে যেমন এইগুলিকে পৃথক্ ভাবে দৃষ্টি করাই প্রচলিত, হিন্দুরা তদ্রূপ ইহাদের মধ্যে প্রভেদ দেখেন না। আমরা ধর্ম্ম ও দর্শনকে এক বস্তুরই দুইটী বিভিন্ন-ভাব বলিয়া বিবেচনা করি, আর আমাদের ধারণা—উভয়টীই তুল্য ভাবে যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। পর-বর্ত্তী বক্তৃতাসমূহে আমি প্রথমে ভারতের—শুধু ভারতের কেন, সমগ্র জগতের—সর্ব্বপ্রাচীন দর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম সাংখ্যদর্শন বুঝাইবার চেষ্টা করিব। ইহার শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা কপিল সমুদয় হিন্দুমনোবিজ্ঞানের জনক, আর তিনি যে প্রাচীন দর্শনপ্রণালীর উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনও আজকালকার ভারতীয় সমুদয় প্রচলিত দর্শনপ্রণালীসমূহের ভিত্তিস্বরূপ। এই সকল দর্শনের অন্যান্য বিষয়ে যত মতভেদ থাকুক না কেন, সকলেই সাংখ্যের মনোবিজ্ঞান গ্রহণ করিয়াছেন।

তার পর আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব, সাংখ্যের স্বাভাবিক পরিণতিস্বরূপ বেদান্ত কেমন উহারই সিদ্ধান্তগুলিকে লইয়া আরো অধিকদূর অগ্রসর হইয়াছেন। কপিল কর্ত্তৃক উপদিষ্ট সৃষ্টি বা

ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বের সহিত উহা একমত হইলেও বেদান্ত দ্বৈতবাদকেই চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। উহা বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম উভয়েরই চরম লক্ষ্যস্বরূপ চরম একত্বের অনুসন্ধান করিয়া গিয়াছেন। এই বিষয় তাঁহারা কি উপায়ে সাধিত করিয়াছেন, তাহা এই বক্তৃতাবলীর সর্ব্বশেষ বক্তৃতাগুলিতে দেখাইবার চেষ্টা করা যাইবে।

প্রথম অধ্যায়।

সাংখ্যীয় ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব।

দুইটী শব্দ রহিয়াছে—ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ও বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড; অন্তর ও বহিঃ। আমরা অনুভূতি দ্বারাই এই উভয় হইতেই সত্য লাভ করিয়া থাকি; আভ্যন্তর অনুভূতি ও বাহ্য অনুভূতি। আভ্যন্তর অনুভূতি দ্বারা সংগৃহীত সত্যসমূহ মনোবিজ্ঞান, দর্শন ও ও ধর্ম্মনামে পরিচিত, আর বাহ্য অনুভূতি হইতে ভৌতিক বিজ্ঞানের উৎপত্তি। এক্ষণে কথা এই, যাহা সম্পূর্ণ সত্য, তাহার এই উভয় জগতের অনুভূতির সহিতই সমন্বয় থাকিবে। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সত্যসমূহে সাক্ষ্য প্রদান করিবে, তদ্রূপ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডও ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের সত্যে সায় দিবে। ভৌতিক সত্যের অবিকল প্রতিকৃতি অন্তর্জ্জগতে থাকা চাই, আবার অন্তর্জ্জগতের সত্যের প্রমাণও বহির্জ্জগতে পাওয়া চাই। তথাপি আমরা কার্য্যতঃ দেখিতে পাই, এই সকল সত্যের অধিকাংশই সর্ব্বদাই পরস্পর বিরোধী। জগতের ইতিহাসের এক যুগে দেখা যায়, "অন্তর্ব্বাদী"র প্রাধান্য হইল; অমনি তাঁহারা "বহির্ব্বাদী"র সহিত বিবাদ আরম্ভ করিলেন। বর্ত্তমানকালে "বহির্ব্বাদী" অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকেরা প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, আর তাঁহারা মনস্তত্ত্ববিৎ ও দার্শনিকগণের অনেক সিদ্ধান্ত উড়াইয়া দিয়াছেন। আমার ক্ষুদ্র-

জ্ঞানে আমি যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাতে আমি দেখিতে পাই, মনোবিজ্ঞানের প্রকৃত সারভাগের সহিত আধুনিক জড়বিজ্ঞানের সারভাগের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে।

সকল ব্যক্তিরই সকল বিষয়ে বড় হইবার শক্তি প্রকৃতি দেন নাই; এইরূপ তিনি সকল জাতিকেই সর্ব্বপ্রকার বিত্থার অনুসন্ধানে সমান শক্তিসম্পন্ন করিয়া গঠন করেন নাই। আধুনিক ইউরোপীয় জাতিরা বাহ্য ভৌতিক তত্ত্বের অনুসন্ধানে সুদক্ষ, কিন্তু প্রাচীন ইউরোপীয়গণ মানবের আভ্যন্তরভাগের অনুসন্ধানে তত পটু ছিলেন না। অপর দিকে আবার প্রাচ্যেরা বাহ্য ভৌতিক জগতের তত্ত্বানুসন্ধানে তত দক্ষ ছিলেন না, কিন্তু অন্তস্তত্ত্বগবেষণায় তাঁহারা খুব দক্ষতা দেখাইয়াছেন। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, প্রাচ্যজাতির ভৌতিক জগতের তত্ত্বসম্বন্ধীয় মতের সহিত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের মত মিলে না, আবার পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান প্রাচ্যজাতির ঐ তত্ত্বসম্বন্ধীয় উপদেশের সহিত মিলে না। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ প্রাচ্য ভূতবিজ্ঞানবাদীদের সমালোচনা করিয়াছেন। তাহা হইলেও উভয়ই সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, আর আমরা যেমন পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে কোন বিত্থায়ই হউক না, প্রকৃত সত্যের মধ্যে কখন পরস্পর বিরোধ থাকিতে পারে না, আভ্যন্তর সত্যসমূহের সহিত বাহ্য সত্যের সমন্বয় আছে।

আমরা আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্ ও বৈজ্ঞানিকদের মতানুযায়ী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিসম্বন্ধীয় মত কি তাহা জানি, আর ইহাও জানি যে, উহা প্রাচীন দলের ধর্ম্মবাদিগণের কিরূপ ভয়ানক ক্ষতি করিয়াছে;

যেমন যেমন এক একটী নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হই-তেছে, তেমনি যেন তাঁহাদের গৃহে একটি করিয়া বোমা পড়িতেছে, আর সেই জন্যই তাঁহারা সকল যুগেই এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমতঃ, আমরা ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব ও তদানুষঙ্গিক বিষয় সম্বন্ধে প্রাচ্যজাতির মনস্তত্ত্ব ও বিজ্ঞানদৃষ্টিতে কি ধারণা ছিল, তাহা আলোচনা করিব; তাহা হইলে আপনারা দেখিবেন যে, কিরূপ আশ্চর্য্যভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের সমুদয় আধুনিকতম আবিষ্ক্রিয়ার সহিত উহাদের সামঞ্জস্য রহিয়াছে, আর যদি কোথাও কিছু অসম্পূর্ণ থাকে, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের দিকে। ইংরাজীতে আমরা সকলে Nature শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। প্রাচীন হিন্দুদার্শনিকগণ উহাকে দুইটী বিভিন্ন নামে অভিহিত করিতেন; ১ম, 'প্রকৃতি'—ইংরাজী Nature শব্দের সহিত ইহা প্রায় সমানার্থক, আর ২য়টী অপেক্ষাকৃত বৈজ্ঞানিক নাম—'অব্যক্ত'—যাহা ব্যক্ত বা প্রকাশিত বা ভেদাত্মক নহে—উহা হইতেই সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, উহা হইতেই অণু পরমাণু সমুদয় আসিয়াছে, উহা হইতেই ভূত, শক্তি, মন, বুদ্ধি সমুদয় আসিয়াছে। ইহা অতি বিস্ময়কর যে, ভারতীয় দার্শনিকগণ অনেক যুগ পূর্ব্বেই বলিয়া গিয়াছেন যে, মন সূক্ষ্ম জড়মাত্র। কারণ, আমাদের আধুনিক জড়বাদীরা—দেহ যেমন প্রকৃতি হইতে প্রসূত, মনও তদ্রূপ,—ইহা ব্যতীত আর অধিক কি দেখাইবার চেষ্টা করিতে-ছেন? চিন্তা সম্বন্ধেও তাহাই; আর ক্রমশঃ আমরা দেখিব, বুদ্ধিও সেই একই অব্যক্ত নামধেয় প্রকৃতি হইতে প্রসূত হইয়াছে।

প্রাচীন আচার্য্যগণ এই অব্যক্তের লক্ষণ করিয়াছেন—"তিনটী শক্তির সাম্যাবস্থা।" তন্মধ্যে একটীর নাম সত্ত্ব, দ্বিতীয়টী রজঃ ও তৃতীয়টী তমঃ। তমঃ—সর্ব্বনিম্নতম শক্তি আকর্ষণস্বরূপ, রজঃ তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চতর—উহা বিকর্ষণস্বরূপ—আর সর্ব্বোচ্চ শক্তি এই উভয়ের সংযমস্বরূপ—উহাই সত্ত্ব। অতএব যখনই এই আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তিদ্বয় সত্ত্বের দ্বারা সম্পূর্ণ সংযত হয় বা সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থায় থাকে, তখন আর সৃষ্টি বা বিকার থাকে না, কিন্তু যাই এই সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়, তখনই উহাদের সামঞ্জস্য নষ্ট হয় আর উহাদের মধ্যে একটী শক্তি অপরগুলি হইতে প্রবলতর হইয়া উঠে। তখনই পরিবর্ত্তন ও গতি আরম্ভ হয় এবং এই সমুদয়ের পরিণাম চলিতে থাকে। এইরূপ ব্যাপার চক্রের গতিতে চলিতেছে। অর্থাৎ এক সময় আসে, যখন সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হয়, তখন এই বিভিন্ন শক্তি সমুদয় বিভিন্নরূপে সম্মিলিত হইতে থাকে আর তখনই এই ব্রহ্মাণ্ড বাহির হয়। আবার এক সময় আসে, যখন সকল বস্তুরই সেই আদিম সাম্যাবস্থায় প্রত্যাবৃত্ত হইবার উপক্রম হয়, আবার এমন সময় আসে, যখন যাহা কিছু ব্যক্তভাবাপন্ন, সমুদয়েরই সম্পূর্ণ অভাব ঘটে। আবার কিছুকাল পরে এই অবস্থা নষ্ট হইয়া শক্তিগুলি বহির্দ্দিকে প্রসৃত হইবার উপক্রম হয়, আর ব্রহ্মাণ্ড ধীরে ধীরে তরঙ্গাকারে বহির্গত হইতে থাকে। জগতের সকল গতিই তরঙ্গাকারে হয়—একবার উত্থান, আবার পতন।

প্রাচীন দার্শনিকগণের মধ্যে কাহারও কাহারও মত এই যে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই একেবারে কিছুদিনের জন্য লয়প্রাপ্ত হয়; আবার

অপর কাহারও কাহারও মত এই যে, ব্রহ্মাণ্ডের অংশবিশেষেই এই প্রলয় ব্যাপার সংঘটিত হয়। অর্থাৎ মনে করুন, আমাদের এই সৌরজগৎ লয়প্রাপ্ত হইয়া অব্যক্ত অবস্থায় গমন করিল, কিন্তু সেই সময়েই অন্যান্য সহস্র সহস্র জগতে তাহার ঠিক বিপরীত কাণ্ড চলিতেছে। আমি এই দ্বিতীয় মতটীর অর্থাৎ প্রলয় যুগপৎ সকল জগতে সংঘটিত হয় না, বিভিন্ন জগতে বিভিন্ন ব্যাপার চলিতে থাকে—এই মতটীরই অধিক পক্ষপাতী। যাহাই হউক, মূল কথাটা উভয়েতেই এক, অর্থাৎ যাহা কিছু আমরা দেখিতেছি, এই সমগ্র প্রকৃতিই ক্রমান্বয়ে উত্থান-পতন-নিয়মে অগ্রসর হইতেছে। এই সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থায় গমনকে কল্পান্ত বলে। সমগ্র কল্পটী—এই ক্রমবিকাশ ও ক্রমসঙ্কোচ—ভারতের ঈশ্বরবাদিগণ কর্তৃক ঈশ্বরের নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত তুলিত হইয়াছে। ঈশ্বর যেন প্রশ্বাস ত্যাগ করিলে তাঁহা হইতে জগৎ বাহির হয়, আবার উহা তাঁহাতেই প্রত্যাবর্ত্তন করে। যখন প্রলয় হয়, তখন জগতের কি অবস্থা হয়? উহা তখনও বর্ত্তমান থাকে, তবে সূক্ষ্মতর রূপে বা কারণাবস্থায় থাকে। দেশকালনিমিত্ত তথায়ও বর্ত্তমান, তবে উহারা অব্যক্তভাব প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র। এই অব্যক্তাবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তনকে ক্রমসঙ্কোচ বা প্রলয় বলে। প্রলয় ও সৃষ্টি বা ক্রমসঙ্কোচ ও ক্রমাভিব্যক্তি অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে, অতএব আমরা যখন আদি বা আরম্ভের কথা বলি, তখন আমরা এক কল্পের আরম্ভকেই লক্ষ্য করিয়া থাকি।

ব্রহ্মাণ্ডের সম্পূর্ণ বাহ্য ভাগকে—আজকাল আমরা যাহাকে

স্থূল জড় বলি—প্রাচীন হিন্দুগণ ভূত বলিতেন। তাঁহাদের মতে উহাদের মধ্যে একটী অবশিষ্টগুলির কারণ, যেহেতু অন্যান্য সকল ভূত এই এক ভূত হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। এই ভূত আকাশ নামে অভিহিত। আজকাল ইথার বলিতে যাহা বুঝায়, ইহা কতকটা তৎসদৃশ, যদিও সম্পূর্ণ এক নহে। আকাশই আদিভূত —উহা হইতেই সমুদয় স্থূল বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে, আর উহার সঙ্গে প্রাণ নামে আর একটী জিনিষ থাকে—আমরা ক্রমশঃ দেখিব, উহা কি। যতদিন সৃষ্টি থাকে, ততদিন এই প্রাণ ও আকাশ থাকে। তাহারা নানারূপে মিলিত হইয়া এই সমুদয় স্থূল প্রপঞ্চ গঠন করিয়াছে, অবশেষে কল্পান্তে ঐগুলি সমুদয় লয়প্রাপ্ত হইয়া আকাশ ও প্রাণের অব্যক্তরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করে। জগতের মধ্যে প্রাচীনতম শাস্ত্র ঋগ্বেদে সৃষ্টিবর্ণনাত্মক অপূর্ব্ব কবিত্বময় শ্লোক আছে ; যথা,—

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং
তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং
কিমাবরীবঃ ইত্যাদি।

ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১২৯
(নাসদীয়) সূক্ত।

অর্থাৎ যখন সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না, তমের দ্বারা তম আবৃত ছিল, তখন কি ছিল ?

আর ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে যে,

আনীদবাতং ইত্যাদি।

ঐ।

ইনি (সেই অনাদি অনন্ত পুরুষ) গতিশূন্য বা নিশ্চেষ্ট ভাবে ছিলেন।

প্রাণ ও আকাশ তখন সেই অনন্ত পুরুষে সুপ্তভাবে ছিল, কিন্তু কোনরূপ ব্যক্ত প্রপঞ্চ ছিল না। এই অবস্থাকে অব্যক্ত বলে—উহার ঠিক শব্দার্থ স্পন্দনরহিত বা অপ্রকাশিত। ক্রম-বিকাশের জন্য একটী নূতন কল্পের আদিতে এই অব্যক্ত স্পন্দিত হইতে থাকে, আর প্রাণ আকাশের উপর ক্রমাগত ঘাতের পর ঘাত দিতে দিতে ক্রমশঃ উহা স্থূল হইতে থাকে, আর ক্রমে আকর্ষণ-বিকর্ষণ-শক্তিদ্বয়ের বলে পরমাণু গঠিত হয়। এইগুলি পরে আরও স্থূলতর হইয়া দ্ব্যণুকাদিতে পরিণত হয় এবং সর্ব্বশেষে প্রাকৃতিক প্রত্যেক পদার্থ যদ্দ্বারা নির্ম্মিত, সেই সকল বিভিন্ন স্থূল ভূতে পরিণত হয়।

আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, লোকে এই গুলির অতি অদ্ভুত ইংরাজী অনুবাদ করিয়া থাকে। অনুবাদকগণ অনুবাদের জন্য প্রাচীন দার্শনিকগণের ও তাঁহাদের টীকাকারগণের সহায়তা গ্রহণ করেন না আর নিজেদেরও এতদূর বিদ্যা নাই যে, আপনা-পনি ঐ গুলি বুঝিতে পারেন। তাঁহারা ভূতগুলিকে বায়ু, অগ্নি ইত্যাদি রূপে অনুবাদ করিয়া থাকেন। যদি তাঁহারা ভাষ্যকার-গণের ভাষ্য আলোচনা করিতেন, তবে তাঁহারা দেখিতে পাইতেন যে, তাঁহারা ঐ গুলিকে লক্ষ্য করেন নাই। প্রাণের বারম্বার আঘাতে আকাশ হইতে বায়ু বা আকাশের স্পন্দনশীল অবস্থা উপস্থিত হয় ও উহা হইতেই পরে বাষ্পীয় ভূতের উৎপত্তি হয়।

স্পন্দন ক্রমশঃ দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতে থাকিলে উত্তাপ বা তেজের উৎপত্তি হয়। ক্রমশঃ উত্তাপ কমিয়া শীতল হইতে থাকে, তখন ঐ বাষ্পীয় পদার্থ তরল ভাব ধারণ করে, উহাকে অপ্ বলে; অবশেষে উহা কঠিনাকার প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম পৃথিবী। সর্ব্বপ্রথমে আকাশের স্পন্দনশীল অবস্থা, তার পর উত্তাপ, তার পর উহা তরল হইয়া যাইবে, আর যখন আরো অধিক ঘনীভূত হইবে, তখন উহা কঠিন জড়পদার্থের আকার ধারণ করিবে। ঠিক ইহার বিপরীতক্রমে সমুদয় অব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। কঠিন বস্তু সকল তরলাকারে পরিণত হইবে, তরলাবস্থা গিয়া কেবল উত্তাপরাশিরূপে পরিণত হইবে, তাহা আবার ধীরে ধীরে বাষ্পীয় ভাব ধারণ করিবে, পরে পরমাণুসমূহ বিশ্লিষ্ট হইতে আরম্ভ হয়, ও সর্ব্বশেষে সমুদয় শক্তির সামঞ্জস্য অবস্থা উপস্থিত হয়। তখন স্পন্দন বন্ধ হয়—এইরূপে কল্পান্ত হয়। আমরা আধুনিক জ্যোতিষ হইতে জানিতে পারি যে, আমাদের এই পৃথিবী ও সূর্য্যের সেই অবস্থা পরিবর্ত্তন চলিয়াছে, শেষে এই কঠিনাকার পৃথিবী গলিয়া গিয়া তরলাকার এবং অবশেষে বাষ্পাকার ধারণ করিবে।

প্রাণ স্বয়ং আকাশের সাহায্য ব্যতীত কোন কার্য্য করিতে পারে না। উহার সম্বন্ধে আমরা কেবল এইটুকু জানি যে, উহা গতি বা স্পন্দন। আমরা যাহা কিছু গতি দেখিতে পাই, তাহা এই প্রাণের বিকারস্বরূপ আর জড় বা ভূত পদার্থ যাহা কিছু আমরা জানি, যাহা কিছু আকৃতিমান্ বা বাধাত্মক, তাহাই এই আকাশের বিকার। এই প্রাণ স্বয়ং থাকিতে পারে না বা কোন মধ্যবর্ত্তী

ব্যতীত কার্য্য করিতে পারে না, আর উহার কোন অবস্থায়—উহা কেবল প্রাণরূপেই বর্ত্তমান থাকুক অথবা মাধ্যাকর্ষণ বা কেন্দ্রাতিগাশক্তিরূপ প্রাকৃতিক অন্যান্য শক্তিতেই পরিণত হউক,—উহা কখন আকাশ হইতে পৃথক্ থাকিতে পারে না। আপনারা কখন ভূত ব্যতীত শক্তি বা শক্তি ব্যতীত ভূত দেখেন নাই। আমরা যাহাদিগকে ভূত ও শক্তি বলি, তাহারা কেবল এই দুইটীর স্থূল প্রকাশ মাত্র,আর ইহাদের অতি সূক্ষ্মাবস্থাকেই প্রাচীন দার্শনিকগণ প্রাণ ও আকাশ নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রাণকে আপনারা জীবনীশক্তি বলিতে পারেন, কিন্তু উহাকে শুধু মানবের জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিলে অথবা আত্মার সহিত অভিন্ন ভাবিয়া বুঝিলেও চলিবে না। অতএব সৃষ্টি—প্রাণ ও আকাশের সংযোগোৎপন্ন, আর উহার আদিও নাই, অন্তও নাই; উহার আদি অন্ত কিছুই থাকিতে পারে না, কারণ, অনন্ত কাল ধরিয়া উহা চলিয়াছে।

তার পর আর একটী অতি দুরূহ ও জটিল প্রশ্ন আসিতেছে। কতকগুলি ইউরোপীয় দার্শনিক বলিয়াছেন, 'আমি' আছি বলিয়াই এই জগৎ আছে, আর 'আমি' যদি না থাকি, তবে এই জগৎও থাকিবে না। কখন কখন ঐ কথাই এই ভাবে প্রকাশ করা হইয়া থাকে, যথা, যদি জগতের সকল লোক মরিয়া যায়, মনুষ্যজাতি আর যদি না থাকে, অনুভূতি ও বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন কোন প্রাণী যদি না থাকে, তবে এই জগৎপ্রপঞ্চও আর থাকিবে না। এ কথা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু ক্রমে আমরা

স্পষ্টই দেখিব যে, ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ ইউরোপীয় দার্শনিকগণ এই তত্ত্বটী জানিলেও মনোবিজ্ঞান অনুসারে উহা ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। তাঁহারা এই তত্ত্বের আভাস মাত্র পাইয়াছেন।

প্রথমতঃ, আমরা এই প্রাচীন মনোবৈজ্ঞানিকগণের আর একটী সিদ্ধান্ত লইয়া আলোচনা করিব—উহাও একটু অদ্ভুত রকমের—তাহা এই যে, স্থূল ভূতগুলি সূক্ষ্ম ভূত হইতে উৎপন্ন। যাহা কিছু স্থূল, তাহাই কতকগুলি সূক্ষ্ম বস্তুর সমবায়-স্বরূপ, অতএব স্থূলভূতগুলিও কতকগুলি সূক্ষ্মবস্তুগঠিত—ঐ গুলিকে সংস্কৃত ভাষায় তন্মাত্রা বলে। আমি একটী পুষ্প আঘ্রাণ করিতেছি; উহার গন্ধ পাইতে গেলে, কিছু অবশ্য আমার নাসিকার সংস্পর্শে আসিতেছে। ঐ পুষ্প রহিয়াছে—উহা আমার দিকে চলিয়া আসিতেছে, দেখিতে পাইতেছি না; কিন্তু যদি কিছু আমার নাসিকার সংস্পর্শে না আসিয়া থাকে, তবে আমি গন্ধ কিরূপে পাইতেছি? ঐ পুষ্প হইতে যাহা আসিয়া আমার নাসিকার সংস্পর্শে আসিতেছে, তাহাই তন্মাত্রা, ঐ পুষ্পেরই অতি সূক্ষ্ম পরমাণু, উহা এত সূক্ষ্ম যে, যদি আমরা সারা দিন সকলে মিলিয়া উহার গন্ধ আঘ্রাণ করি, তথাপি ঐ পুষ্পের পরিমাণের কিছুমাত্র হ্রাস বোধ হইবে না। তাপ, আলোক, এবং অন্যান্য সকল বস্তু সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। এই তন্মাত্রাগুলি আবার পরমাণু-রূপে পুনর্বিভক্ত হইতে পারে। এই পরমাণুর পরিমাণ লইয়া বিভিন্ন দার্শনিকগণের বিভিন্ন মত আছে; কিন্তু আমরা জানি,

ঐগুলি মতবাদ মাত্র, সুতরাং আমরা বিচারস্থলে ঐ গুলিকে পরিত্যাগ করিলাম। এইটুকু জানিলেই আমাদের যথেষ্ট যে, যাহা কিছু স্থূল, তাহাই অতি সূক্ষ্ম পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত। প্রথম আমরা পাইতেছি স্থূল ভূত—আমরা উহা বাহিরে অনুভব করিতেছি, তার পর সূক্ষ্ম ভূত—এই সূক্ষ্ম ভূতের দ্বারাই স্থূল ভূত গঠিত, উহারই সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়গণের অর্থাৎ নাসিকা, চক্ষু ও কর্ণাদির স্নায়ুর সংযোগ হইতেছে। যে ইথার-তরঙ্গ আমার চক্ষুকে স্পর্শ করিতেছে, তাহা আমি দেখিতে পাইতেছি না, তথাপি আমি জানি, আলোক দেখিতে পাইবার পূর্ব্বে চাক্ষুষ স্নায়ুর সহিত উহার সংযোগ প্রয়োজন। শ্রবণসম্বন্ধেও তদ্রূপ। আমা দের কর্ণের সংস্পর্শে যে তন্মাত্রাগুলি আসিতেছে, তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি না; কিন্তু আমরা জানি, সেগুলি অবশ্যই আছে। এই তন্মাত্রাগুলির আবার কারণ কি? আমাদের মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ ইহার এক অতি অদ্ভুত ও বিস্ময়জনক উত্তর দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, তন্মাত্রাগুলির কারণ 'অহং-কার' বা 'অহংতত্ত্ব' বা 'অহংজ্ঞান'। ইহাই এই সমুদয় সূক্ষ্ম ভূতগুলির এবং ইন্দ্রিয়গুলিরও কারণ। ইন্দ্রিয় কোন্‌গুলি? এই চক্ষু রহিয়াছে, কিন্তু চক্ষু দেখে না। যদি চক্ষু দেখিত, তবে মানুষের যখন মৃত্যু হয়, তখন ত চক্ষু অবিকৃত থাকে, তবে তাহারা তখনও দেখিতে পাইত। কোনখানে কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কোন কিছু মানুষের ভিতর হইতে চলিয়া আর সেই কিছু, যাহা প্রকৃত পক্ষে দেখে, চক্ষু যাহার যন্ত্রস্বরূপ

মাত্র, তাহাই যথার্থ ইন্দ্রিয়। এইরূপ এই নাসিকাও একটী যন্ত্র মাত্র, উহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত একটী ইন্দ্রিয় আছে। আধুনিক শারীরবিধানশাস্ত্র আপনাদিগকে বলিয়া দিবেন, উহা কি। উহা মস্তিষ্কস্থ একটী স্নায়ুকেন্দ্রমাত্র। চক্ষুকর্ণাদি কেবল বাহ্যযন্ত্রমাত্র। অতএব এই স্নায়ুকেন্দ্র বা ইন্দ্রিয়গণই অনুভূতির যথার্থ স্থান।

নাসিকার জন্য একটী, চক্ষের জন্য একটী, এইরূপ প্রত্যেকের জন্য এক একটী পৃথক্ স্নায়ুকেন্দ্র বা ইন্দ্রিয় থাকিবার প্রয়োজন কি? একটীতেই কার্য্য সিদ্ধ হয় না কেন? এইটী স্পষ্ট করিয়া বুঝান যাইতেছে। আমি কথা কহিতেছি, আপনারা আমার কথা শুনিতেছেন; আপনারা আপনাদের চতুর্দ্দিকে কি হইতেছে তাহা দেখিতে পাইতেছেন না, কারণ, মন কেবল শ্রবণেন্দ্রিয়েই সংযুক্ত হইয়াছে, চক্ষুরিন্দ্রিয় হইতে আপনাকে পৃথক্ করিয়াছে। যদি একটী মাত্র স্নায়ুকেন্দ্র বা ইন্দ্রিয় থাকিত, তবে মনকে এক সময়েই দেখিতে, শুনিতে ও আঘ্রাণ করিতে হইত। আর উহার পক্ষে এক সময়েই এই তিনটী কার্য্য না করা অসম্ভব হইত। অতএব প্রত্যেকটীর জন্য পৃথক্ পৃথক্ স্নায়ুকেন্দ্রের প্রয়োজন। আধুনিক শারীরবিধানশাস্ত্রও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়া থাকেন। অবশ্য আমাদের পক্ষে এক সময়েই দেখা ও শুনা সম্ভব, কিন্তু তাহার কারণ—মন উভয় কেন্দ্রেই আংশিক ভাবে সংযুক্ত হয়। তবে যন্ত্র কোন্‌গুলি হইল? আমরা দেখিতেছি, উহারা বাহিরের বস্তু এবং স্থূলভূতে নির্ম্মিত—এই আমাদের চক্ষু কর্ণ নাসা প্রভৃতি। আর এই স্নায়ুকেন্দ্রগুলি কিসে নির্ম্মিত? উহারা সূক্ষ্মতর ভূতে নির্ম্মিত

আর উহারা যেহেতু অনুভূতির কেন্দ্রস্বরূপ, সেই জন্য উহারা ভিতরের জিনিষ। যেমন প্রাণকে বিভিন্ন স্থূল শক্তিতে পরিণত করিবার জন্য এই দেহ স্থূলভূতে গঠিত হইয়াছে, তদ্রূপ এই শরীরের পশ্চাতে যে স্নায়ুকেন্দ্রসমূহ রহিয়াছে, তাহারাও প্রাণকে সূক্ষ্ম অনুভূতির শক্তিতে পরিণত করিবার জন্য সূক্ষ্মতর উপাদানে নির্ম্মিত। এই সমুদয় ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের সমষ্টিকে একত্রে লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর বলে।

এই সূক্ষ্ম শরীরের প্রকৃত পক্ষে একটী আকার আছে, কারণ, ভৌতিক যাহা কিছু, তাহারই একটী আকার অবশ্যই থাকিবে। ইন্দ্রিয়গণের পশ্চাতে মন অর্থাৎ বৃত্তিযুক্ত চিত্ত আছে, উহাকে চিত্তের স্পন্দনশীল বা অস্থির অবস্থা বলা যাইতে পারে। যদি একটী স্থির হ্রদে একটী প্রস্তর নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে প্রথমে উহাতে স্পন্দন বা কম্পন উপস্থিত হইবে, তার পর উহা হইতে বাধা বা প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইবে। মুহূর্ত্তের জন্য ঐ জল স্পন্দিত হইবে, তার পর উহা ঐ প্রস্তরের উপর প্রতিক্রিয়া করিবে। এইরূপ চিত্তের উপর যখনই কোন বাহ্যবিষয়ের আঘাত আসে, তখনই উহা একটু স্পন্দিত হয়। চিত্তের এই অবস্থাকে মন বলে। তার পর উহা হইতে প্রতিক্রিয়া হয়, উহার নাম বুদ্ধি। এই বুদ্ধির পশ্চাতে আর একটী জিনিষ আছে, উহা মনের সকল ক্রিয়ার সহিতই বর্ত্তমান থাকে, উহাকে অহঙ্কার বলে—এই অহঙ্কার অর্থে অহংজ্ঞান, যাহাতে সর্ব্বদা 'আমি আছি' এই জ্ঞান হয়।

তাহার পশ্চাতে মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব—উহা প্রাকৃতিক সকল বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহার পশ্চাতে পুরুষ—ইনিই মানবের যথার্থ স্বরূপ, শুদ্ধ, পূর্ণ, ইনিই একমাত্র দ্রষ্টা এবং ইঁহার জন্যই এই সমুদয় পরিণাম। পুরুষ এই সকল পরিণামপরম্পরা দেখিতেছেন। তিনি স্বয়ং কখনই অশুদ্ধ নহেন, কিন্তু অধ্যাস বা প্রতিবিম্বের দ্বারা তাঁহাকে তদ্রূপ দেখাইতেছে, যেমন একখণ্ড স্ফটিকের সমক্ষে একটী লাল ফুল রাখিলে স্ফটিকটি লাল দেখাইবে, আবার নীল ফুল রাখিলে উহা নীল দেখাইবে। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু স্ফটিকটীর কোন বর্ণ নাই। পুরুষ বা আত্মা অনেক, প্রত্যেকেই শুদ্ধ ও পূর্ণ আর এই স্থূল, সূক্ষ্ম নানা প্রকারে বিভক্ত ভূত তাঁহাদের উপর প্রতিবিম্বিত হইয়া তাঁহাদিগকে নানাবর্ণের দেখাইতেছে। প্রকৃতি কেন এ সকল করিতেছেন? প্রকৃতির এই সকল পরিণাম পুরুষ বা আত্মার ভোগ ও অপবর্গের জন্য—যাহাতে পুরুষ আপনার মুক্ত স্বভাব জানিতে পারেন। মানবের সমক্ষে এই জগৎপ্রপঞ্চরূপ সুবৃহৎ গ্রন্থ বিস্তৃত রহিয়াছে, যাহাতে মানব ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরিণামে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষরূপে জগতের বাহিরে আসিতে পারেন। আমাকে এখানে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, আমাদের অনেক ভাল ভাল মনস্তত্ত্ববিদেরা আপনারা যে ভাবে সগুণ বা ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তদ্রূপ ভাবে তাঁহাতে বিশ্বাস করেন না। সকল মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের পিতাস্বরূপ কপিল সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তাঁহার ধারণা এই যে,—

সগুণ ঈশ্বর স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই; যাহা কিছু ভাল, প্রকৃতিই সমুদয় করিতে সমর্থ। তিনি তথা-কথিত 'কৌশল-বাদ' (Design Theory) খণ্ডন করিয়াছেন। আর এই মতবাদের ন্যায় ছেলেমানুষী মত আর কিছুই জগতে প্রচারিত হয় নাই। তবে তিনি এক বিশেষ প্রকার ঈশ্বর স্বীকার করেন। তিনি বলেন—আমরা সকলে মুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছি, আর এইরূপ চেষ্টা করিতে করিতে যখন মানবাত্মা মুক্ত হন, তখন তিনি যেন কিছু দিনের জন্য প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকিতে পারেন। আগামী কল্পের প্রারম্ভে তিনিই একজন সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষরূপে আবির্ভূত হইয়া সেই কল্পের শাসনকর্ত্তা হইতে পারেন। এই অর্থে তাঁহাকে ঈশ্বর বলা যাইতে পারে। এইরূপে আপনি, আমি এবং অতি সামান্য ব্যক্তি পর্য্যন্ত বিভিন্ন কল্পে ঈশ্বর হইতে পারেন। কপিল বলেন, এইরূপ জন্য ঈশ্বর হইতে পারেন, কিন্তু নিত্য ঈশ্বর অর্থাৎ নিত্য, সর্ব্বশক্তিমান্, জগতের শাসনকর্ত্তা কখনই হইতে পারেন না। এরূপ ঈশ্বর স্বীকারে এই আপত্তি ঘটে—ঈশ্বরকে হয় বদ্ধ না হয় মুক্ত উভয়ের একতর স্বীকার করিতে হইবে। যদি ঈশ্বর মুক্ত হন তবে তিনি সৃষ্টি করিবেন না; কারণ, তাঁহার সৃষ্টি করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আর যদি তিনি বদ্ধ হন, তাহা হইলেও তাঁহাতে সৃষ্টিকর্তৃত্ব অসম্ভব; কারণ, বদ্ধ বলিয়া তাঁহার শক্তির অভাব, সুতরাং তাঁহার সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। সুতরাং উভয় পক্ষেই দেখা গেল, নিত্য, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর থাকিতে পারেন

না। এই হেতু কপিল বলেন, আমাদের শাস্ত্রে—বেদে—যেখানেই ঈশ্বর শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহাতে, যে সকল আত্মা পূর্ণতা ও মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইতেছে। সাংখ্য দর্শন, সকল আত্মার একত্বে বিশ্বাসী নহেন। বেদান্তের মতে সমুদয় জীবাত্মা ব্রহ্মনামধেয় এক বিশ্বাত্মায় অভিন্ন, কিন্তু সাংখ্যদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা কপিল দ্বৈতবাদী ছিলেন। তিনি অবশ্য জগতের বিশ্লেষণ যতদূর করিয়াছেন, তাহা অতি অদ্ভুত। তিনি হিন্দু পরিণামবাদিগণের জনকস্বরূপ, আর পরবর্ত্তী দার্শনিক শাস্ত্রগুলি তাঁহারই চিন্তাপ্রণালীর পরিণামমাত্র।

সাংখ্যদর্শনমতে সকল আত্মাই তাহাদের স্বাধীনতা বা মুক্তি এবং সর্ব্বশক্তিমত্তা ও সর্ব্বজ্ঞতারূপ স্বাভাবিক অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইবে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, আত্মার এই বন্ধন কোথা হইতে আসিল? সাংখ্য বলেন, ইহা অনাদি। কিন্তু তাহাতে এই আপত্তি উপস্থিত হয় যে, যদি এই বন্ধন অনাদি হয়, তবে উহা অনন্তও হইবে, আর তাহা হইলে আমরা কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারিব না। কপিল ইহার উত্তরে বলেন, এখানে এই 'অনাদি' বলিতে নিত্য অনাদি বুঝিতে হইবে না। প্রকৃতি অনাদি ও অনন্ত, কিন্তু আত্মা বা পুরুষ যে অর্থে অনাদি অনন্ত, সে অর্থে নহে; কারণ, প্রকৃতিতে ব্যক্তিত্ব নাই। যেমন আমাদের সম্মুখ দিয়া একটী নদী প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, প্রতি মুহূর্ত্তেই উহাতে নূতন নূতন জলরাশি আসিতেছে আর এই সমুদয় জল-রাশির নাম নদী—কিন্তু নদী কোন এক বস্তু হইল না। এইরূপ

প্রকৃতির অন্তর্গত যাহা কিছু, তাহার সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু আত্মার কখনই পরিবর্ত্তন হয় না। অতএব প্রকৃতি যখন সদাই পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে, তখন আত্মার পক্ষে প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া সম্ভব। সাংখ্যদিগের একটী মত অনন্য-সাধারণ। তাঁহাদের মতে একটী মনুষ্য বা যে কোন একটী প্রাণী যে নিয়মে গঠিত, সমগ্র জগদ্ব্রহ্মাণ্ড ও ঠিক সেই নিয়মে বিরচিত। সুতরাং আমাদের যেমন একটী মন আছে, তদ্রূপ একটী বিশ্ব-মনও আছে। যখন এই বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমবিকাশ হয়, তখন প্রথমে মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব, পরে অহঙ্কার, পরে তন্মাত্রা, ইন্দ্রিয় ও শেষে স্থূল ভূতের উৎপত্তি হয়। কপিলের মতে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই এক শরীরস্বরূপ। যাহা কিছু দেখিতেছি, সেগুলি সমুদয় স্থূল শরীর, উহাদের পশ্চাতে সূক্ষ্ম শরীরসমূহ এবং তাহাদের পশ্চাতে সমষ্টি অহংতত্ত্ব, তাহারও পশ্চাতে সমষ্টি বুদ্ধি। কিন্তু এই সকলই প্রকৃতির অন্তর্গত, সকলই প্রকৃতির বিকাশ, এগুলির কিছুই উহার বাহিরে নাই। আমাদের মধ্যে সকলেই সেই বিশ্ব-চৈতন্যের অংশস্বরূপ। সমষ্টি বুদ্ধিতত্ত্ব রহিয়াছে, তাহা হইতে যাহা আমাদের প্রয়োজন, গ্রহণ করিতেছি; এইরূপ জগতের ভিতরে সমষ্টি মনস্তত্ত্ব রহিয়াছে, তাহা হইতেও আমরা চিরকালই প্রয়োজনমত লইতেছি। কিন্তু দেহের বীজ পিতামাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া চাই। ইহাতে বংশানুক্রমিকতা (Heredity) ও পুনর্জ্জন্মবাদ উভয় তত্ত্বই স্বীকৃত হইয়া থাকে। আত্মাকে দেহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য উপাদান দিতে হয়, কিন্তু

সেই উপাদান বংশানুক্রমিক সঞ্চারের দ্বারা পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আমরা এক্ষণে এই সিদ্ধান্তের আলোচনায় উপস্থিত হইতেছি যে, সাংখ্যমতানুযায়ী সৃষ্টিবাদে সৃষ্টি বা ক্রমবিকাশ এবং প্রলয় বা ক্রমসঙ্কোচ—এই উভয়টীই স্বীকৃত হইয়াছে। সমুদয়ই সেই অব্যক্ত প্রকৃতির ক্রমবিকাশে উৎপন্ন, আবার ঐ সমুদয়ই ক্রম-সঙ্কুচিত হইয়া অব্যক্তাকার ধারণ করে। সাংখ্যমতে এমন কোন জড় বা ভৌতিক বস্তু থাকিতে পারে না, জ্ঞানের কোন অংশ-বিশেষও যাহার উপাদান নহে। জ্ঞানই সেই উপাদান, যাহা হইতে এই সমুদয় প্রপঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছে। আগামী বক্তৃতায় ইহার বিশদ ব্যাখ্যা করা যাইবে। তবে এক্ষণে আমি এইটুকু দেখাইব যে, কিরূপে ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। আমি এই টেবিলটীর স্বরূপ কি, তাহা জানি না, উহা কেবল আমার উপর এক প্রকার সংস্কার জন্মাইতেছে মাত্র। উহা প্রথমে চক্ষুতে আসে, তার পর দর্শনেন্দ্রিয়ে গমন করে, তার পর উহা মনের নিকটে আসে। তখন মন আবার উহার উপর প্রতিক্রিয়া করে, সেই প্রতিক্রিয়াকেই আমরা টেবিল আখ্যা দিয়া থাকি। ইহা ঠিক একটী হ্রদে একখণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপের ন্যায়। ঐ হ্রদ প্রস্তরখণ্ডের অভিমুখে একটী তরঙ্গ নিক্ষেপ করে; আর ঐ তরঙ্গ-টীকেই আমরা জানিয়া থাকি। মনের তরঙ্গসমূহ যাহারা বহির্দ্দিকে আসিয়া থাকে, তাহাদিগকেই আমরা জানি। এইরূপই এই দেয়ালের আকৃতি আমার মনে রহিয়াছে; বাহিরে যথার্থ কি আছে,

তাহা কেহই জানে না। যখন আমি উহাকে জানিতে চেষ্টা করি, তখন আমি উহাতে যে উপাদান প্রদান করি, উহাকে তাহা হইতে হয়। আমি আমার নিজ মনের দ্বারা আমার চক্ষুর উপাদানভূত বস্তু দিয়াছি, আর বাহিরে যাহা আছে, তাহা কেবল উদ্দীপক বা উত্তেজক কারণ মাত্র; সেই উত্তেজক কারণ আসিলে আমি আমার মনকে উহার দিকে প্রক্ষেপ করি এবং উহা আমার দ্রষ্টব্য বস্তুর আকার ধারণ করিয়া থাকে। এক্ষণে প্রশ্ন এই, আমরা সকলেই এক বস্তু কিরূপে দেখিয়া থাকি? ইহার কারণ এই যে, আমাদের সকলের ভিতর এই বিশ্ব-মনের এক এক অংশ আছে। যাহাদের মন আছে, তাহারাই ঐ বস্তু দেখিবে; যাহাদের নাই, তাহারা উহা দেখিবে না। ইহাতেই প্রমাণ হয়, যতদিন ধরিয়া জগৎ আছে, ততদিন মনের অভাব—সেই এক বিশ্ব-মনের অভাব—কখন হয় নাই। প্রত্যেক মানব, প্রত্যেক প্রাণী—সেই বিশ্ব-মন হইতেই নির্ম্মিত হইতেছে, কারণ, উহা সদাই বর্ত্তমান এবং উহাদের নির্ম্মাণের জন্য উপাদান যোগাইতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রকৃতি ও পুরুষ।

আমরা যে তত্ত্বগুলি লইয়া বিচার করিতেছিলাম, এক্ষণে সেইগুলির প্রত্যেকটীকে লইয়া বিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আমাদের স্মরণ থাকিতে পারে, আমরা প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। সাংখ্যমতাবলম্বিগণ উহাকে অব্যক্ত বা অবিভক্ত বলিয়াছেন এবং উহার অন্তর্গত উপাদান সকলের সাম্যাবস্থারূপে উহার লক্ষণ করিয়াছেন। আর ইহাতে স্বভাবতঃই ইহা পাওয়া যাইতেছে যে, সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থা বা সামঞ্জস্যে কোনরূপ গতি থাকিতে পারে না। আমরা যাহা কিছু দেখি, শুনি বা অনুভব করি, সমুদয়ই জড় ভূত ও গতির সমবায়মাত্র। এই প্রপঞ্চ বিকাশের পূর্ব্বে আদিম অবস্থায় যখন কোনরূপ গতি ছিল না, যখন সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থা ছিল, তখন এই প্রকৃতি অবিনাশী ছিল, কারণ, সীমাবদ্ধ হইলেই তাহার বিশ্লেষণ বা বিয়োজন হইতে পারে। আবার সাংখ্যমতে পরমাণু জগতের আদিম অবস্থা নহে। এই জগৎ পরমাণুপুঞ্জ হইতে উৎপন্ন হয় নাই, উহারা দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থা হইতে পারে। আদি ভূতই পরমাণুরূপে পরিণত হয়, তাহা আবার তদপেক্ষা স্থূলতর পদার্থে

পরিণত হয়, আর আজকালকার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান যতদূর চলিয়াছে, তাহাতে ঐ মতের পোষকতা করিতেছে বলিয়াই বোধ হয়। উদাহরণস্বরূপ—ইথার-সম্বন্ধীয় আধুনিক মতের কথা ধরুন। যদি বলেন, ইথারও পরমাণুপুঞ্জের সমবায়ে উৎপন্ন, তাহা হইলে তাহাতে কিছুতেই সমস্যার মীমাংসা হইবে না। আরও স্পষ্ট করিয়া এই বিষয় বুঝান যাইতেছে। বায়ু অবশ্য পরমাণুপুঞ্জে গঠিত। আর আমরা জানি, ইথার সর্ব্বত্র বিদ্যমান, উহা সকলের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান ও সর্ব্বব্যাপী। বায়ু এবং অন্যান্য সকল বস্তুর পরমাণুও যেন ঐ ইথারেই ভাসিতেছে। যদি আবার ইথার পরমাণুসমূহের সংযোগে গঠিত হয়, তাহা হইলে দুইটী ইথারের পরমাণুর মধ্যেও কিঞ্চিৎ অবকাশ থাকিবে। ঐ অবকাশ কিসের দ্বারা পূর্ণ? আর যাঁহা কিছু ঐ অবকাশ ব্যাপিয়া থাকিবে, তাহার পরমাণুগণের মধ্যেও ঐরূপ অবকাশ থাকিবে। যদি বলেন, ঐ অবকাশের মধ্যে আরও সূক্ষ্মতর ইথার বর্ত্তমান, তাহা হইলে সেই ইথার পরমাণুর মধ্যেও আবার অবকাশ স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম ইথার কল্পনা করিতে করিতে শেষ সিদ্ধান্ত কিছুই পাওয়া যাইবে না—ইহাকে অনবস্থা দোষ বলে। অতএব পরমাণুবাদ চরম সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। সাংখ্যমতে প্রকৃতি সর্ব্বব্যাপী, উহা এক সর্ব্বব্যাপী জড়রাশিস্বরূপ, তাহাতে—এই জগতে যাহা কিছু আছে—সমুদয়ের কারণ রহিয়াছে। কারণ বলিতে কি বুঝায়? কারণ বলিতে ব্যক্ত অবস্থার সূক্ষ্মতর অবস্থাকে বুঝায়—

যাহা ব্যক্ত হয়, তাহারই অব্যক্ত অবস্থা। বিনাশ বলিতে কি বুঝায়? বিনাশ অর্থে কারণে লয়, কারণাবস্থা প্রাপ্তি, যে সকল উপাদান হইতে কোন বস্তু নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহারা তাহাদের আদিম অবস্থায় চলিয়া যায়। বিনাশ শব্দের এই অর্থ ব্যতীত সম্পূর্ণ অভাব অর্থ যে অসম্ভব, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। কপিল অনেক যুগ পূর্ব্বে বিনাশের যে কারণলয় অর্থ করিয়াছিলেন, বাস্তবিক উহাতে যে তাহাই বুঝায়, তাহা আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানানুসারে প্রমাণ করা যাইতে পারে। 'সূক্ষ্মতর অবস্থায় গমন,' ব্যতীত বিনাশের আর কোন অর্থ নাই। আপনারা জানেন, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে কিরূপে ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, ভূত অবিনশ্বর। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা রসায়ন বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন যে, যদি একটী কাচনলের ভিতর একটী বাতি ও কাষ্টকির পেন্‌সিল রাখা যায় এবং বাতিটী সমুদয় পুড়াইয়া ফেলা হয়, তবে ঐ কাষ্টকির পেন্সিলটী বাহির করিয়া ওজন করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ পেন্সিলটীর ওজন এক্ষণে, উহার পূর্ব্ব ওজনের সহিত বাতিটীর ওজন যোগ করিলে যাহা হয়, ঠিক তত হইয়াছে। ঐ বাতিটীই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া কাষ্টকিতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। অতএব আমাদের আজকালকার জ্ঞানোন্নতির অবস্থায় যদি কেহ বলে যে, কোন জিনিষ সম্পূর্ণ অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সে নিজেই কেবল উপহাসাস্পদ হইবে। কেবল অশিক্ষিত ব্যক্তিই এরূপ কথা বলিবে, আর আশ্চর্য্যের বিষয়—সেই প্রাচীন দার্শনিকগণের

উপদেশ আধুনিক জ্ঞানের সহিত মিলিতেছে। প্রাচীনেরা মনকে ভিত্তিস্বরূপ লইয়া তাঁহাদের অনুসন্ধানে অগ্রসর হইয়াছিলেন; তাঁহারা এই ব্রহ্মাণ্ডের মানসিক ভাগটীর বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন আর আধুনিক বিজ্ঞান উহার ভৌতিক ভাগ বিশ্লেষণ করিয়া ঠিক সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। উভয়প্রকার বিশ্লেষণই একই সত্যে উপনীত হইয়াছে।

আপনাদের অবশ্যই স্মরণ আছে যে, এই জগতে প্রকৃতির প্রথম বিকাশকে সাংখ্যবাদিগণ মহৎ বলিয়া থাকেন। আমরা উহাকে সমষ্টি বুদ্ধি বলিতে পারি—উহার ঠিক শব্দার্থ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। প্রকৃতির প্রথম বিকাশ এই বুদ্ধি। উহাকে অহংজ্ঞান বলা যায় না, বলিলে ভুল হইবে। অহংজ্ঞান এই বুদ্ধিতত্ত্বের অংশবিশেষ মাত্র—বুদ্ধিতত্ত্ব কিন্তু সার্ব্বজনীন তত্ত্ব। অহংজ্ঞান, অব্যক্ত জ্ঞান ও জ্ঞানাতীত অবস্থা—এই সকলগুলিই উহার অন্তর্গত। উদাহরণস্বরূপ—প্রকৃতিতে কতকগুলি পরিবর্ত্তন আপনাদের চক্ষের সমক্ষে ঘটিতেছে, আপনারা সেগুলি দেখিতেছেন ও বুঝিতেছেন কিন্তু আবার কতকগুলি পরিবর্ত্তন আছে, সেগুলি এত সূক্ষ্ম যে, কোন মানবীয় বোধশক্তিরই উহারা আয়ত্ত নহে। এই উভয় প্রকার পরিবর্ত্তন একই কারণ হইতে হইতেছে, সেই একই মহৎ ঐ উভয়প্রকার পরিবর্ত্তনই সাধন করিতেছে। আবার কতকগুলি পরিবর্ত্তন আছে, যেগুলি আমাদের মন বা বিচারশক্তির অতীত। এই সকল পরিবর্ত্তনগুলিই এই

মহত্তের মধ্যে। ব্যষ্টি লইয়া যখন আমি আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব, তখন এ কথা আপনারা আরো ভাল করিয়া বুঝিবেন। এই মহৎ হইতে সমষ্টি অহংতত্ত্বের উৎপত্তি আর এই উভয়টীই ভৌতিক। ভূত ও মনে পরিমাণগত ভেদ ব্যতীত অন্য কোনরূপ ভেদ নাই—একই বস্তুর সূক্ষ্ম ও স্থূলাবস্থা, একটী আর একটীতে পরিণত হইতেছে। ইহার সহিত আধুনিক শারীরবিধানশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের ঐক্য আছে আর মস্তিষ্ক হইতে পৃথক্ একটী মন আছে, ইহা এবং এতদ্বিধ সমুদয় অসম্ভব বিষয়ে বিশ্বাস করিলে যেরূপ বিজ্ঞানশাস্ত্রের সহিত বিরোধ ও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তাহা হইতে এই বিশ্বাসে ঐ বিরোধ হইতে রক্ষা পাইবেন। মহৎ নামক এই পদার্থ অহংতত্ত্ব নামক, জড় পদার্থের সূক্ষ্মাবস্থাবিশেষে পরিণত হয় এবং সেই অহংতত্ত্বের আবার দুই প্রকার পরিণাম হয়। তন্মধ্যে এক প্রকার পরিণাম—ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় দুই প্রকার—কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়। কিন্তু ইন্দ্রিয় বলিতে এই পরিদৃশ্যমান চক্ষুকর্ণাদি বুঝাইতেছে না, ইন্দ্রিয় এইগুলি হইতে সূক্ষ্মতর—যাহাকে আপনারা মস্তিষ্ককেন্দ্র ও স্নায়ুকেন্দ্র বলেন। এই অহংতত্ত্ব পরিণাম প্রাপ্ত হয় আর এই অহংতত্ত্বরূপ উপাদান হইতে এই কেন্দ্র ও স্নায়ু সকল উৎপন্ন হয়। অহংতত্ত্বরূপ সেই একই উপাদান হইতে আর এক প্রকার সূক্ষ্ম পদার্থের উৎপত্তি হয়—তন্মাত্রা অর্থাৎ সূক্ষ্ম ভৌতিক পরমাণু। যাহা আপনাদের নাসিকার সংস্পর্শে আসিয়া আপনাদিগকে ঘ্রাণে সমর্থ করে, তাহাই তন্মাত্রার একটী দৃষ্টান্ত। আপনারা এই সূক্ষ্ম তন্মাত্রাগুলিকে

প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না; আপনারা কেবল তাহারা যে আছে, ইহা অবগত হইতে পারেন। অহংতত্ত্ব হইতে এই তন্মাত্রাগুলির উৎপত্তি হয়, আর ঐ তন্মাত্রা বা সূক্ষ্ম ভূত হইতে স্থূল ভূতের অর্থাৎ বায়ু, জল, পৃথিবী এবং অন্যান্য যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই বা অনুভব করি, তাহাদের উৎপত্তি হয়। আমি এই বিষয়টি আপনাদের মনে দৃঢ় ভাবে মুদ্রিত করিয়া দিতে ইচ্ছা করি। এটী ধারণা করা বড় কঠিন, কারণ, পাশ্চাত্য দেশে মন ও ভূত সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণা আছে। মস্তিস্ক হইতে ঐ সকল সংস্কার দূর করা বড়ই কঠিন। বাল্যকালে পাশ্চাত্য দর্শনে শিক্ষিত হওয়ায় আমাকেও এই তত্ত্ব বুঝিতে ভয়ানক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

এই সমুদয়গুলিই জগতের অন্তর্গত। ভাবিয়া দেখুন, প্রথমাবস্থায় এক, সর্ব্বব্যাপী, অখণ্ড, অবিভক্ত জড়রাশি রহিয়াছে। যেমন দুগ্ধ পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া দধি হয়, তদ্রূপ উহা মহৎ নামক অন্য এক পদার্থে পরিণত হয়—ঐ মহৎ এক অবস্থায়* বুদ্ধিতত্ত্বরূপে অবস্থান করে, অন্য অবস্থায় উহা অহং-তত্ত্বরূপে পরিণত হয়। উহা সেই একই বস্তু, কেবল অপেক্ষাকৃত স্থূলতর আকারে পরিণত হইয়া অহংতত্ত্ব নাম ধারণ করিয়াছে। এইরূপে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যেন স্তরে স্তরে বিরচিত। প্রথমে অব্যক্ত প্রকৃতি, উহা সর্ব্বব্যাপী বুদ্ধিতত্ত্বে বা মহতে পরিণত হয়,

* ভাষার ভঙ্গীতে পাঠকের মনে হইতে পারে, বুদ্ধিতত্ত্ব মহতের অবস্থাবিশেষ। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু তাহা নহে; যাহাকে মহৎ বলা যায়, তাহাই বুদ্ধিতত্ত্ব।

তাহা আবার সর্ব্বব্যাপী অহংতত্ত্ব বা অহংকারে এবং তাহা পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বব্যাপী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভূতে * পরিণত হয়। সেই ভূত, সমষ্টি ইন্দ্রিয় বা কেন্দ্রসমূহে এবং সমষ্টি সূক্ষ্ম পরমাণু সমূহে পরিণত হয়। পরে এইগুলি মিলিত হইয়া এই স্থূল জগৎ-প্রপঞ্চের উৎপত্তি। সাংখ্যমতে ইহাই সৃষ্টির ক্রম আর বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যাহা আছে, তাহা সমষ্টি বা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেও অবশ্য থাকিবে।

ব্যষ্টিস্বরূপ একটী মানুষের কথা ধরুন। প্রথমতঃ, তাঁহার ভিতর সেই সাম্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতির অংশ রহিয়াছে। সেই জড়-স্বরূপা প্রকৃতি তাঁহার ভিতর মহৎরূপে পরিণত হইয়াছে—সেই মহৎ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী বুদ্ধিতত্ত্বের এক অংশ তাঁহার ভিতর রহিয়াছে। আর সেই সর্ব্বব্যাপী বুদ্ধিতত্ত্বের ক্ষুদ্র অংশটী তাঁহার ভিতর অহংতত্ত্বে বা অহংকারে পরিণত হইয়াছে—উহা সেই সর্ব্বব্যাপী অহংতত্ত্বেরই ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। এই অহঙ্কার আবার ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রায় পরিণত হইয়াছে। তন্মাত্রাগুলি আবার

* পূর্ব্বে সাংখ্যমতানুযায়ী যে সৃষ্টির ক্রম বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সহিত এই স্থানে স্বামীজির কিঞ্চিৎ বিরোধ আপাততঃ বোধ হইতে পারে। পূর্ব্বে বুঝান হইয়াছে, অহংতত্ত্ব হইতে ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রার উৎপত্তি হয়। এখানে আবার উহাদের মধ্যে 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভূতের' কথা বলিতেছেন। এটী কি কোন নূতন তত্ত্ব? আমার বোধ হয়, অহংতত্ত্ব একটী অতি সূক্ষ্ম পদার্থ বলিয়া তাহা হইতে ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রার উৎপত্তি সহজে বুঝাইবার জন্য স্বামীজি এইরূপ 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভূতের' কল্পনা করিয়াছেন।

পরস্পর মিলিত করিয়া তিনি নিজ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড—দেহ—বিরচন করিয়াছেন। এই বিষয়টী আমি সুস্পষ্টরূপে আপনাদিগকে বুঝাইতে চাই, কারণ, ইহা বেদান্ত বুঝিবার পক্ষে প্রথম সোপান-স্বরূপ, আর ইহা আপনাদের জানা অত্যাবশ্যক, কারণ, ইহাই সমগ্র জগতের বিভিন্নপ্রকার দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ। জগতে এমন কোন দর্শনশাস্ত্র নাই, যাহা এই সাংখ্য দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা কপিলের নিকট ঋণী নহে। পিথাগোরাস ভারতে আসিয়া এই দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং গ্রীকদের নিকট ইহার কতকগুলি তত্ত্ব লইয়া গিয়াছিলেন। পরে উহা আলেক্‌জান্দ্রিয়ার দার্শনিক সম্প্রাদায়ের * ভিত্তিস্বরূপ হয় এবং আরও পরবর্ত্তী কালে উহা নষ্টিক দর্শনের† (Gnostic Philosophy) ভিত্তি হয়।

---

* Alexandrian School—নিও-প্লেটনিক সম্প্রদায়কেই এই আলেক্‌জান্দ্রিয় দার্শনিক সম্প্রদায়-সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া পরিগণিত করা যাইতে পারে। খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার কিছু পরেই ইহার আবির্ভাব হয় এবং অনেক দিন ধরিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত ইহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা প্লোটিনোসের মতে যুক্তি-বিচার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ অসম্ভব, উহা সমাধি-লভ্য। তিনি স্বয়ং জীবনে ৩ বার সমাধি লাভ করিয়াছিলেন।

† Gnostic (নষ্টিক)—খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রথমাবস্থা হইতেই এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। ইঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম জানেন বলিয়া দাবী করিতেন। এই মত প্রাচ্য ও গ্রীকদর্শন এবং খ্রীষ্টধর্ম্মের মিশ্রণস্বরূপ। ইঁহাদের প্রধান মত এই যে, মনবুদ্ধির অগোচর

এইরূপে উহা দুই ভাগে বিভক্ত হয়। একভাগ ইউরোপ ও আলেক্জান্দ্রিয়ায় গেল, ও অপর ভাগটী ভারতেই রহিল এবং সর্ব্বপ্রকার হিন্দুদর্শনের ভিত্তিস্বরূপ হইল, কারণ, ব্যাসের বেদান্ত দর্শন ইহারই পরিণতিস্বরূপ। এই কাপিল দর্শনই জগতের মধ্যে যুক্তি-বিচার দ্বারা জগত্তত্ত্বব্যাখ্যার সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা। জগতের সকল দার্শনিকেরই উচিত—তাঁহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা। আমি আপনাদের মনে এইটী বিশেষ করিয়া মুদ্রিত করিয়া দিতে চাই যে, দর্শন শাস্ত্রের জনক বলিয়া আমরা তাঁহার উপদেশ শুনিতে বাধ্য এবং তিনি যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য। এমন কি, বেদেও এই অদ্ভুত ব্যক্তির, এই সর্ব্বপ্রাচীন দার্শনিকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার অনুভূতি সমুদয় কি অপূর্ব্ব! যদি যোগিগণের অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ শক্তির কোন প্রমাণ প্রয়োগ আবশ্যক হয়, তবে বলিতে হয়, এইরূপ ব্যক্তিগণই তাহার প্রমাণ। তাঁহারা কিরূপে এই সকল তত্ত্ব উপলব্ধি করিলেন? তাঁহাদের ত আর অণুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ ছিল না। তাঁহাদের অনুভবশক্তি কি সূক্ষ্ম ছিল, তাঁহাদের বিশ্লেষণ কেমন নির্দ্দোষ ও কি অদ্ভুত!

পরমেশ্বর হইতে জগৎ ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়াছে। এক একটি বিকাশকে ইয়ন (Aeon) বলে। আরও ইহাদের মতে ঈশ্বর 'কিছু না' হইতে জগৎ সৃজন করেন নাই। 'হাইল' (Hyle) নামধেয় আদিভূত হইতে তিনি জগৎ সৃষ্ট করেন।

যাহা হউক, এক্ষণে পূর্ব্বপ্রসঙ্গের অনুবৃত্তি করা যাউক। আমরা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড মানবের তত্ত্ব আলোচনা করিতেছিলাম। আমরা দেখিয়াছি, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড যে নিয়মে নির্ম্মিত, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডও তদ্রূপ। প্রথমে অবিভক্ত বা সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতি। তার পর উহা বৈষম্য প্রাপ্ত হইলে কার্য্য আরম্ভ হয়, আর এই কার্য্যের ফলে যে প্রথম পরিণাম হয়, তাহা মহৎ অর্থাৎ বুদ্ধি। এক্ষণে আপনারা দেখিতেছেন, মানুষের মধ্যে যে এই বুদ্ধি রহিয়াছে, তাহা সর্ব্বব্যাপী বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহতের ক্ষুদ্র অংশস্বরূপ। উহা হইতে অহং-জ্ঞানের উদ্ভব, তাহা হইতে অনুভবাত্মক ও গত্যাত্মক স্নায়ুসকল, এবং সূক্ষ্ম পরমাণু বা তন্মাত্রা। ঐ তন্মাত্রা হইতেই স্থূল দেহ বিরচিত হয়। আমি এখানে বলিতে চাই, শোপেনহাওয়ারের দর্শন ও বেদান্তে একটী প্রভেদ আছে। শোপেনহাওয়ার বলেন, বাসনা বা ইচ্ছা সমুদয়ের কারণ। আমাদের এই ব্যক্তভাবাপন্ন হইবার কারণ, প্রাণ ধারণের ইচ্ছা, কিন্তু অদ্বৈতবাদীরা ইহা অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, মহত্তত্ত্বই ইহার কারণ। এমন একটীও ইচ্ছা হইতে পারে না, যাহা প্রতিক্রিয়াস্বরূপ নহে। ইচ্ছার অতীত অনেক বস্তু রহিয়াছে। উহা অহং হইতে গঠিত একটী জিনিষ, অহং আবার তদপেক্ষা উচ্চতর বস্তু অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন এবং তাহা আবার অব্যক্ত প্রকৃতির বিকারস্বরূপ।

মানুষের মধ্যে এই যে মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব রহিয়াছে, তাহার স্বরূপ উত্তমরূপে বুঝা বিশেষ প্রয়োজন। এই মহত্তত্ত্বই আমরা

যাহাকে অহং বলি, তাহাতে পরিণত হয় আর এই মহত্তত্ত্বই সেই সমুদয় পরিবর্ত্তনের কারণ, যাহাদের ফলে এই শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে। মহত্তত্ত্বের ভিতর জ্ঞানের নিম্নভূমি, সাধারণ জ্ঞানের অবস্থা ও জ্ঞানাতীত অবস্থা এই সমুদয়গুলিই রহিয়াছে। এই তিনটী অবস্থা কি? জ্ঞানের নিম্নভূমি আমরা পশুগণে দেখিয়া থাকি এবং উহাকে সহজাত জ্ঞান (Instinct) বলিয়া থাকি। ইহা প্রায় অভ্রান্ত, তবে উহা দ্বারা জ্ঞাতব্য বিষয়ের সীমা বড় অল্প। সহজাত জ্ঞানে প্রায় কখনই ভুল হয় না। একটী পশু ঐ সহজাতজ্ঞানপ্রভাবে কোন্ শস্যটী আহার্য্য, কোন্টী বা বিষাক্ত, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারে, কিন্তু ঐ সহজাত জ্ঞান দু একটী সামান্য বিষয়ে সীমবদ্ধমাত্র, উহা যন্ত্রবৎ কার্য্য করিয়া থাকে। তার পর আমাদের সাধারণ জ্ঞান—উহা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর অবস্থা। এই আমাদের সাধারণ জ্ঞান ভ্রান্তিময়, উহা পদে পদে ভ্রমে পতিত হয়, কিন্তু উহার গতি এরূপ মৃদু হইলেও উহার পরিসর অনেক-দূর। ইহাকেই আপনারা যুক্তি বা বিচারশক্তি বলিয়া থাকেন। সহজাত জ্ঞান অপেক্ষা উহার প্রসার অধিক দূর বটে, কিন্তু সহজাত জ্ঞান অপেক্ষা যুক্তিবিচারে অধিক ভ্রমের আশঙ্কা। ইহা অপেক্ষা মনের আর এক উচ্চতর অবস্থা রহিয়াছে, জ্ঞানাতীত অবস্থা—ঐ অবস্থায় কেবল যোগীদেরই অর্থাৎ যাঁহারা চেষ্টা করিয়া ঐ অবস্থা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদেরই অধিকার। উহা সহজাত জ্ঞানের ন্যায় অভ্রান্ত, আবার যুক্তিবিচার হইতেও উহার অধিক প্রসার। উহা সর্ব্বোচ্চ অবস্থা। আমাদের ইহা স্মরণ

রাখা বিশেষ আবশ্যক যে, যেমন মানবের ভিতর মহৎই জ্ঞানের নিম্নভূমি, সাধারণ জ্ঞানভূমি ও জ্ঞানাতীত ভূমি, অর্থাৎ জ্ঞান যে তিন অবস্থায় অবস্থান করে, এই সমুদয়ভাবে প্রকাশিত হইতেছে, সেইরূপ এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেও এই সর্ব্বব্যাপী বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহৎ—এইরূপ সহজাত জ্ঞান, যুক্তিবিচারজনিত জ্ঞান ও বিচারাতীত জ্ঞান, এই ত্রিবিধ ভাবে অবস্থিত।

এক্ষণে একটী সূক্ষ্ম প্রশ্ন আসিতেছে, আর এই প্রশ্ন সর্ব্বদাই জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে। যদি পূর্ণ ঈশ্বর এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে এখানে অপূর্ণতা কেন? আমরা যতটুকু দেখিতেছি, ততটুকুকেই ব্রহ্মাণ্ড বা জগৎ বলি—আর উহা আমাদের সাধারণ জ্ঞান বা যুক্তিবিচারজনিত জ্ঞানের এই ক্ষুদ্র ভূমি ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহার বাহিরে আমরা আর কিছুই দেখিতে পাই না। এই প্রশ্নটীই যে একটী অসম্ভব প্রশ্ন। যদি আমি একটী বৃহৎ বস্তুরাশি হইতে ক্ষুদ্র অংশবিশেষ গ্রহণ করি ও উহার দিকে দৃষ্টিপাত করি, স্বভাবতঃই উহা অসম্পূর্ণ বোধ হইবে। এই জগৎ অসম্পূর্ণ বোধ হয়, কারণ, আমরাই উহাকে অসম্পূর্ণ করিয়াছি। কিরূপে আমরা ইহা করিলাম? প্রথমে বুঝিয়া দেখা যাক্—যুক্তিবিচার কাহাকে বলে, জ্ঞান কাহাকে বলে। জ্ঞান অর্থে সদৃশ বস্তুর সহিত মিলন। আপনারা রাস্তায় গিয়া একটী মানুষকে দেখিলেন, দেখিয়া জানিলেন—তিনি মানুষ। আপনারা অনেক মানুষ দেখিয়াছেন, প্রত্যেকেই আপনাদের মনে একটী সংস্কার উৎপাদন করিয়াছে। একটী

নূতন মানুষকে দেখিবামাত্র আপনারা উহাকে আপনাদের সংস্কারের ভাণ্ডারে লইয়া গিয়া দেখিলেন—তথায় মানুষের অনেক ছবি রহিয়াছে। তখন এই নূতন ছবিটী অবশিষ্টগুলির সহিত উহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট খোপে রাখিলেন—তখন আপনারা তৃপ্ত হইলেন। কোন নূতন সংস্কার আসিলে যদি আপনাদের মনে উহার সদৃশ সংস্কার সকল পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান থাকে, তবেই আপনারা তৃপ্ত হন, আর এই মিলন বা সহযোগকেই জ্ঞান বলে। অতএব জ্ঞান অর্থে পূর্ব্ব হইতেই আমাদের যে অনুভূতি-সমষ্টি রহিয়াছে, তাহাদের সহিত আর একটী অনুভূতিকে এক খোপে পোরা। আর আপনাদের পূর্ব্ব হইতেই একটী জ্ঞানভাণ্ডার না থাকিলে যে নূতন কোন জ্ঞানই হইতে পারে না, ইহাই তাহার অন্যতম প্রবল প্রমাণ। যদি আপনাদের পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা কিছু না থাকে, অথবা কতকগুলি ইউরোপীয় দার্শনিকের যেমন মত, মন যদি 'অনুৎকীর্ণ ফলক' (Tabula Rasa) স্বরূপ হয়, তবে উহার পক্ষে কোন প্রকার জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব; কারণ, জ্ঞান অর্থেই পূর্ব্ব হইতে যে সংস্কারসমষ্টি অবস্থিত, তাহার সহিত তুলনা করিয়া নূতনের গ্রহণমাত্র। জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান থাকা চাই, যাহার সহিত এই নূতন সংস্কারটীকে মিলাইবেন। মনে করুন, একটী শিশু এই জগতে জন্মগ্রহণ করিল, যাহার এই জ্ঞানভাণ্ডার নাই; তাহা হইলে তাহার পক্ষে কোন প্রকার জ্ঞান লাভ করা একেবারে অসম্ভব। অতএব স্বীকার করিতেই হইবে যে, ঐ শিশুর অবশ্যই

ঐরূপ একটী জ্ঞানভাণ্ডার ছিল, আর এইরূপে অনন্তকাল ধরিয়া জ্ঞান লাভ হইতেছে। এই সিদ্ধান্ত এড়াইবার কোন মতে যো নাই। ইহা গণিতের ন্যায় ধ্রুব সিদ্ধান্ত। ইহা অনেকটা স্পেন্সার ও অন্যান্য কতকগুলি ইউরোপীয় দার্শনিকগণের সিদ্ধান্তের সদৃশ। তাঁহারা এই পর্য্যন্ত দেখিয়াছেন যে, অতীত জ্ঞানের ভাণ্ডার না থাকিলে কোন প্রকার জ্ঞান লাভ অসম্ভব, অতএব শিশু পূর্ব্ব-জ্ঞান লইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাঁহারা এই সত্য বুঝিয়াছেন যে, কারণ কার্য্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে, উহা সূক্ষ্মাকারে আসিয়া পরে বিকাশপ্রাপ্ত হয়। তবে এই দার্শনিকেরা বলেন যে, শিশু যে সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহা তাহার নিজের অতীত অবস্থার জ্ঞান হইতে লব্ধ নহে, উহা তাহার পূর্ব্বপুরুষদিগের সঞ্চিত সংস্কার; বংশানুক্রমিক সঞ্চরণের দ্বারা উহা সেই শিশুর ভিতর আসিয়াছে। অতিশীঘ্রই ইঁহারা বুঝিবেন যে, এই মতবাদ প্রমাণসহ নহে, আর ইতিমধ্যেই অনেকে এই বংশানুক্রমিক সঞ্চরণ মতের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন। এই মত অসত্য নহে, কিন্তু অসম্পূর্ণ। উহা কেবল মানবের জড়ের ভাগটাকে ব্যাখ্যা করে মাত্র। যদি বলেন—এই মতানুযায়ী পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব কিরূপে ব্যাখ্যা করা যায়? তাহাতে ইঁহারা বলিয়া থাকেন, অনেক কারণ মিলিয়া একটী কার্য্য হয়, পারি-পার্শ্বিক অবস্থা তাহাদের মধ্যে একটী। অপরদিকে হিন্দু দার্শনিক-গণ বলেন, আমরা নিজেরাই আমাদেরই পারিপার্শ্বিক অবস্থার গঠনকর্ত্তা; কারণ, আমরা অতীত অবস্থায় যেরূপ ছিলাম,

বর্ত্তমানেও তাহাই হইব। অন্য কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, আমরা অতীত কালে যেরূপ ছিলাম, এখানে এখনও ঠিক সেই অবস্থাপন্ন হইয়া থাকি।

এক্ষণে আপনারা বুঝিলেন, জ্ঞান বলিতে কি বুঝায়। জ্ঞান আর কিছুই নহে, পুরাতন সংস্কারগুলির সহিত একটী নূতন সংস্কারকে গ্রথিত করা—এক খোপে পোরা—নূতন সংস্কার-টীকে চিনিয়া লওয়া। চিনিয়া লওয়া বা প্রত্যভিজ্ঞার অর্থ কি? আমাদের পূর্ব্ব হইতেই যে সদৃশ সংস্কারগুলি আছে, তাহাদের সহিত উহার মিলন আবিষ্কার। জ্ঞান বলিতে ইহা ছাড়া আর কিছু বুঝায় না। তাহাই যদি হইল, তবে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, এই জ্ঞানলাভপ্রণালীতে যতগুলি সদৃশ বিষয় আছে, সমুদয়গুলিকে দেখিতে হইবে। তাই নয় কি? মনে করুন, আপনাকে একটা প্রস্তরখণ্ডকে জানিতে হইবে, তাহা হইলে উহার সহিত মিল খাওয়াইবার জন্য আপনাকে উহার সদৃশ সমুদয় প্রস্তরখণ্ডগুলিকে দেখিতে হইবে। কিন্তু জগৎসম্বন্ধে আমরা তাহা করিতে পারি না, কারণ, আমাদের সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা আমরা উহার একপ্রকার অনুভবমাত্র পাইয়া থাকি—উহার এদিক্ ওদিকে আমরা কিছুই দেখিতে পাই না, যাহাতে উহার সদৃশ বস্তুর সহিত উহাকে মিলাইতে পারি। সেই জন্য জগৎ আমাদের নিকট অবোধ্য বোধ হয়, কারণ, জ্ঞান ও বিচার সর্ব্বদাই সদৃশ বস্তুর সহিত মিলনসাধনেই নিযুক্ত। ব্রহ্মাণ্ডের এই অংশটী —যাহা আমাদের জ্ঞানাবচ্ছিন্ন, তাহা আমাদের নিকট একটী

বিস্ময়কর নূতন পদার্থ বলিয়া বোধ হয়, আমরা উহার সহিত মিল খাইবে, এমন কোন উহার সদৃশ বস্তু পাই না। এই জন্য উহাকে লইয়া এত হাঙ্গাম—আমরা ভাবি, জগৎ অতি ভয়ানক ও মন্দ; কখন কখন আমরা উহাকে ভাল বলিয়া মনে করি বটে, কিন্তু সাধারণতঃ উহাকে অসম্পূর্ণ ভাবিয়া থাকি। জগৎকে তখনই জানা যাইবে, যখন আমরা ইহার সহিত মিল খায়, এমন সদৃশ বস্তু বাহির করিতে পারিব। আমরা তখনই সেইগুলিকে জানিতে পারিব, যখন, আমরা এই জগতের—আমাদের এই ক্ষুদ্র অহং-জ্ঞানের—বাহিরে যাইব—তখনই কেবল জগৎ আমাদের নিকট জ্ঞাত হইবে। যতদিন না আমরা তাহা করিতেছি, ততদিন আমাদের সমুদয় নিষ্ফল চেষ্টার দ্বারা কখনই উহার ব্যাখ্যা হইবে না, কারণ, জ্ঞান অর্থে সদৃশ বিষয়ের আবিষ্কার, আর আমাদের এই সাধারণ জ্ঞানভূমি আমাদিগকে কেবল জগতের একটী আংশিক ভাব দিতেছে মাত্র। এই সমষ্টি মহৎ অথবা আমরা আমাদের সাধারণ প্রাত্যহিক ব্যবহার্য্য ভাষায় যাঁহাকে ঈশ্বর বলি, তাঁহার ধারণাসম্বন্ধেও তদ্রূপ। আমাদের ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণা যতটুকু আছে, তাহা তাঁহার এক বিশেষপ্রকার জ্ঞানমাত্র, তাঁহার আংশিক ধারণামাত্র—তাঁহার অন্যান্য সমুদয় ভাব আমাদের মানবীয় অসম্পূর্ণতার দ্বারা আবৃত।

"সর্ব্বব্যাপী আমি এত বৃহৎ যে, এই জগৎ পর্য্যন্ত আমার অংশমাত্র।"*

---

* বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।
ভগবদ্গীতা—১০ম, ৪২ শ্লোক।

এই কারণেই আমরা ঈশ্বরকে অসম্পূর্ণ দেখিয়া থাকি, আর আমরা তাঁহার ভাব কখনই বুঝিতে পারি না, কারণ, উহা অসম্ভব। তাঁহাকে বুঝিবার একমাত্র উপায়, যুক্তিবিচারের অতীত প্রদেশে যাওয়া, অহংজ্ঞানের বাহিরে যাওয়া।

"যখন শ্রুত ও শ্রবণ, চিন্তিত ও চিন্তা, এই সমুদয়ের বাহিরে যাইবে, তখনই কেবল সত্য লাভ করিবে।" *

"শাস্ত্রের পারে চলিয়া যাও, কারণ, উহারা প্রকৃতির তত্ত্ব পর্য্যন্ত, উহা যে তিনটী গুণে নির্ম্মিত সেই পর্য্যন্ত—(যাহা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে) শিক্ষা দিয়া থাকে।" †

আমরা ইহাদের বাহিরে যাইলেই সামঞ্জস্য ও মিলন দেখিতে পাই, তাহার পূর্ব্বে নহে।

এ পর্য্যন্ত এটী স্পষ্ট বুঝা গেল যে, এই বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ঠিক একই নিয়মে নির্ম্মিত, আর এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের আমরা একটী খুব সামান্য অংশই জানি। আমরা জ্ঞানের নিম্ন-ভূমিও জানি না, জ্ঞানাতীত ভূমিও জানি না। আমরা কেবল সাধারণ জ্ঞানভূমিই জানি। যদি কোন ব্যক্তি বলে, আমি পাপী—সে নির্ব্বোধমাত্র, কারণ, সে নিজেকে জানে না। সে নিজের সম্বন্ধে অজ্ঞতম। সে নিজের এক অংশকে মাত্র জানে,

* তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ।

ভগবদ্গীতা—২য়, ৫২ শ্লোক।

† ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।

ঐ —২য়, ৪৫ শ্লোক।

কারণ, জ্ঞান তাহার মানসভূমির একাংশব্যাপীমাত্র। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধেও তাহাই। যুক্তিবিচার দ্বারা উহার একাংশমাত্র জানাই সম্ভব, কিন্তু জগৎ প্রপঞ্চ বলিতে জ্ঞানের নিম্নভূমি, সাধারণ জ্ঞানভূমি, জ্ঞানাতীত ভূমি, ব্যষ্টিমহৎ, সমষ্টিমহৎ এবং তাহাদের পরবর্ত্তী সমুদয় বিকার—এই সকলগুলিকেই বুঝাইয়া থাকে আর এইগুলি সাধারণ জ্ঞানের অতীত।

কিসে প্রকৃতিকে পরিণাম প্রাপ্ত করায়? আমরা এ পর্য্যন্ত দেখিয়াছি, প্রাকৃতিক সকল বস্তু, এমন কি, প্রকৃতি স্বয়ংও জড় বা অচেতন। উহারা নিয়মাধীন হইয়া কার্য্য করিতেছে—সমুদয়ই বিভিন্ন দ্রব্যের মিশ্রণস্বরূপ এবং অচেতন। মন, মহত্তত্ত্ব, নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি—এ সবই অচেতন। কিন্তু তাহারা সকলেই এমন এক পুরুষের চিৎ বা চৈতন্যের প্রতিবিম্বে প্রতিবিম্বিত হইতেছে, যিনি এই সকলগুলিরই অতীত, আর সাংখ্যমতাবলম্বিগণ ইঁহাকেই পুরুষ নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই পুরুষ জগতের মধ্যে—প্রকৃতির মধ্যে—এই যে সকল পরিণাম হইতেছে, তাহাদের সাক্ষিস্বরূপ কারণ—অর্থাৎ এই পুরুষকে যদি সার্ব্বজনীন অর্থে ধরা যায়, তবে তিনিই ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর*।

---

* ইতিপূর্ব্বে মহত্তত্ত্বকে ঈশ্বর বলা হইয়াছে, এখানে আবার পুরুষের সার্ব্বজনীন ভাবকে ঈশ্বর বলা হইল। এই দুইটী কথা আপাতবিরোধী বলিয়া বোধ হয়। এখানে এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, পুরুষ মহত্তত্ত্বরূপ উপাধি পরিগ্রহ করিলেই তাঁহাকে ঈশ্বর বলা যায়।

ইহা কথিত হইয়া থাকে যে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইয়াছে। সাধারণ দৈনিক ব্যবহার্য্য বাক্য হিসাবে ইহা অতি সুন্দর বাক্য হইতে পারে, কিন্তু তদপেক্ষা ইহার আর অধিক মূল্য নাই। ইচ্ছা কিরূপে সৃষ্টির কারণ হইতে পারে? ইচ্ছা—প্রকৃতির তৃতীয় বা চতুর্থ বিকার। অনেক বস্তু উহার পূর্ব্বেই হইয়াছে। সেগুলিকে কে সৃষ্টি করিল? ইচ্ছা একটী যৌগিক পদার্থ মাত্র, আর যাহা কিছু যৌগিক, সকলই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। ইচ্ছা স্বয়ং কখন প্রকৃতিকে সৃষ্টি করিতে পারে না। উহা একটী অমিশ্র বস্তু নহে। অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে বলা যুক্তিবিরুদ্ধ। মানুষের ভিতর ইচ্ছা আমাদের অহংজ্ঞানের অল্লাংশমাত্রব্যাপী। কেহ কেহ বলেন, উহা আমাদের মস্তিষ্ককে সঞ্চালিত করে। যদি তাহাই করিত, তবে আপনারা ইচ্ছা করিলেই মস্তিষ্কের কার্য্য বন্ধ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা ত আপনারা পারেন না। সুতরাং ইচ্ছা মস্তিষ্ককে সঞ্চালিত করিতেছে না। হৃদয়কে গতিশীল করিতেছে কে? ইচ্ছা কখনই নহে; কারণ, যদি তাহাই হইত, তবে ইচ্ছা করিলেই হৃদয়ের গতিরোধ করিতে পারিতেন। ইচ্ছা আপনাদের দেহকেও পরিচালিত করিতেছে না, ব্রহ্মাণ্ডকেও নিয়মিত করিতেছে না। অপর কোন বস্তু উহাদের নিয়ামক—ইচ্ছা যাহার একটী বিকাশ মাত্র। এই দেহকে এমন একটী শক্তি পরিচালিত করিতেছে, ইচ্ছা যাহার বিকাশ মাত্র। সমগ্র জগৎ ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হইতেছে না, সেই জন্যই ইচ্ছা বলিলে

ইহার ঠিক ব্যাখ্যা হয় না। মনে করুন, আমি মানিয়া লইলাম, ইচ্ছাই আমাদের দেহকে চালাইতেছে, তার পর এই দেহ ইচ্ছানুসারে আমি পরিচালিত করিতে পারিতেছি না বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম। ইহা ত আমারই দোষ, কারণ, ইচ্ছাই আমাদের দেহপরিচালনকর্ত্তা; ইহা মানিয়া লইবার আমার কোন অধিকার ছিল না। এইরূপই—যদি আমরা মানিয়া লই যে, ইচ্ছাই জগৎ পরিচালন করিতেছে আর তার পর দেখি, প্রকৃত ঘটনার সহিত ইহা মিলিতেছে না, তবে ইহা আমারই দোষ। এই পুরুষ ইচ্ছা নহেন, বা বুদ্ধি নহেন, কারণ, বুদ্ধি একটী যৌগিক পদার্থ মাত্র। কোনরূপ জড় পদার্থ না থাকিলে কোনরূপ বুদ্ধিও থাকিতে পারে না। মানুষে এই জড় মস্তিষ্কাকার ধারণ করিয়াছে। যেখানেই বুদ্ধি আছে, সেখানেই কোন না কোন আকারে জড় পদার্থ থাকিবেই থাকিবে। অতএব বুদ্ধি যখন যৌগিক পদার্থ হইল, তখন পুরুষ কি? উহা মহত্তত্ত্বও নহে, নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিও নহে, কিন্তু উহাদের উভয়েরই কারণ। তাঁহার সান্নিধ্যই উহাদের সকলগুলিকেই ক্রিয়াশীল করে ও পরস্পরে মিলিত করায়। পুরুষকে সেই সকল বস্তুর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, যাহাদের শুধু সান্নিধ্যেই রাসায়নিক কার্য্য ত্বরিত করে, যেমন সোণা গালাইতে গেলে তাহাতে পটাসিয়াম সায়ানাইড (Pottassium Cyanide) মিশাইতে হয়। পটাসিয়াম সায়ানাইড পৃথক্ থাকিয়া যায়, উহার উপর কোন রাসায়নিক কার্য্য হয় না, কিন্তু সোণা গালানরূপ

সফল কার্য্য হইবার জন্য উহার সান্নিধ্য প্রয়োজন। পুরুষ সম্বন্ধেও এই কথা। উহা প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত হয় না, উহা বুদ্ধি বা মহৎ- বা উহার কোনরূপ বিকার নহে, উহা শুদ্ধ পূর্ণ আত্মা।

"আমি সাক্ষিস্বরূপ অবস্থিত থাকাতে প্রকৃতি চেতন ও অচেতন সমুদয় সৃজন করিতেছে।"*

প্রকৃতিতে তাহা হইলে এই চেতনত্ব কোথা হইতে আসিল? পুরুষেই এই চেতনত্বের ভিত্তি, আর ঐ চেতনত্বই পুরুষের স্বরূপ। উহা এমন এক বস্তু, যাহা বাক্যে ব্যক্ত করা যায় না, বুদ্ধি দ্বারা বুঝা যায় না, কিন্তু আমরা যাহাকে জ্ঞান বলি, তাহার উপাদান-স্বরূপ। এই পুরুষ আমাদের এই সাধারণ জ্ঞান নহে, কারণ, জ্ঞান একটী যৌগিক পদার্থ, তবে ঐ জ্ঞানের ভিতর যাহা কিছু উজ্জ্বল ও উত্তম, তাহা ঐ পুরুষেরই। পুরুষে চৈতন্য আছে, কিন্তু পুরুষকে বুদ্ধিমান্ বা জ্ঞানবান্ বলা যাইতে পারে না, কিন্তু উহা এমন বস্তু, যিনি থাকাতেই জ্ঞান সম্ভব হয়। পুরুষের মধ্যে যে চিৎ, তাহা প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া আমাদের নিকট বুদ্ধি বা জ্ঞান নামে পরিচিত হয়। জগতে যে কিছু সুখ, আনন্দ, শান্তি আছে, সমুদয়ই পুরুষের, কিন্তু উহারা মিশ্র; কেন না, উহাতে পুরুষ ও প্রকৃতির মিশ্রণ আছে।

"যেখানে কোনপ্রকার সুখ, যেখানে কোনরূপ আনন্দ,

*ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরং। গীতা—৯ম, ১০ শ্লোক।

তথায়ই সেই অমৃতস্বরূপ পুরুষের এক কণা আছে, বুঝিতে হইবে।"*

এই পুরুষই সমগ্র জগতের মহা আকর্ষণস্বরূপ, তিনি যদিও উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট ও উহার সহিত অসংস্পৃষ্ট, তথাপি তিনি সমগ্র জগৎকে আকর্ষণ করিতেছেন। মানুষে যে কাঞ্চনের অন্বেষণে ধাবমান দেখিতে পান, তাহার কারণ সে না জানিলেও প্রকৃতপক্ষে সেই কাঞ্চনের মধ্যে পুরুষের এক স্ফুলিঙ্গ বিদ্যমান। যখন মানুষ সন্তান প্রার্থনা করে, অথবা স্ত্রীলোক যখন স্বামীর আকাঙ্ক্ষা করে, তখন কোন্ শক্তি তাহাদিগকে আকর্ষণ করে? সেই সন্তান ও সেই স্বামীর ভিতর যে সেই পুরুষের অংশ আছে, তাহাই সেই আকর্ষণী শক্তি। তিনি সকলেরই পশ্চাতে রহিয়াছেন, কেবল উহাতে জড়ের আবরণ পড়িয়াছে। আর কিছুই কাহাকেও আকর্ষণ করিতে পারে না। এই অচেতনাত্মক জগতের মধ্যে সেই পুরুষই একমাত্র চেতন। ইনিই সাংখ্যের পুরুষ। অতএব ইহা হইতে নিশ্চিত বুঝা যাইতেছে যে, এই পুরুষ অবশ্যই সর্ব্বব্যাপী, কারণ, যাহা সর্ব্বব্যাপী নহে, তাহা অবশ্যই সসীম। সমুদয় সীমাবদ্ধ ভাবই কোন কারণের কার্য্যস্বরূপ, আর যাহা কার্য্যস্বরূপ, তাহার অবশ্য আদি অন্ত থাকিবে। যদি পুরুষ সীমাবদ্ধ হন, তবে তিনি অবশ্য বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন, তিনি তাহা হইলে আর চরম তত্ত্ব হইলেন না, তিনি মুক্তস্বরূপ হইলেন না,

* এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্—৪র্থ অধ্যায়, ৩য় ব্রাহ্মণ, ৩২ শ্লোক।

তিনি কোন কারণের কার্য্যস্বরূপ—উৎপন্ন পদার্থ হইলেন। অতএব যদি তিনি সীমাবদ্ধ না হন, তবে তিনি সর্ব্বব্যাপী। কপিলের মতে পুরুষের সংখ্যা এক নহে, বহু। অনন্তসংখ্যক পুরুষ রহিয়াছেন, আপনিও একজন পুরুষ, আমি একজন পুরুষ, প্রত্যেকেই এক একজন পুরুষ—উহারা যেন অনন্তসংখ্যক বৃত্ত-স্বরূপ। তাহার প্রত্যেকটী আবার অনন্ত। পুরুষ জন্মানও না, মরেনও না। তিনি মনও নহেন, ভূতও নহেন। আর আমরা যাহা কিছু জানি, সকলই তাঁহার প্রতিবিম্বস্বরূপ। আমরা নিশ্চিত জানি যে, যদি তিনি সর্ব্বব্যাপী হন, তবে তাঁহার জন্মমৃত্যু কখনই হইতে পারে না। প্রকৃতি তাঁহার উপর নিজ ছায়া—জন্ম ও মৃত্যুর ছায়া প্রক্ষেপ করিতেছে, কিন্তু তিনি স্বরূপতঃ নিত্য। এতদূর পর্য্যন্ত আমরা দেখিলাম, কপিলের মত অতি অপূর্ব্ব।

এইবার আমরা এই সাংখ্যমতের বিরুদ্ধে যাহা যাহা বলিবার আছে, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিব। যতদূর পর্য্যন্ত দেখিলাম, তাহাতে বুঝিলাম—এই বিশ্লেষণ নির্দ্দোষ—ইহার মনোবিজ্ঞান অখণ্ডনীয়—উহার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি হইতে পারে না। আমরা কপিলকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম, প্রকৃতিকে কে সৃষ্টি করিল? আর তাহার উত্তর এই পাইলাম যে, উহা সৃষ্ট নহে। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, পুরুষও অসৃষ্ট ও সর্ব্বব্যাপী, আর এই পুরুষের সংখ্যা অনন্ত। আমাদিগকে সাংখ্যের এই শেষ সিদ্ধান্তটীর প্রতিবাদ করিয়া উৎকৃষ্টতর সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে এবং তাহা করিলেই আমরা বেদান্তের অধিকারে আসিয়া

উপস্থিত হইব। আমরা প্রথমেই এই আশঙ্কা উত্থাপন করিব যে, প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুইটী অনন্ত কি করিয়া থাকিতে পারে। তার পর আমরা এই ভাবে তর্ক করিব যে, উহা সম্পূর্ণ সামান্যী-করণ * (generalisation) নহে, অতএব আমরা সম্পূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হই নাই। তার পর আমরা দেখিব, বেদান্তীরা কিরূপে এই সকল আপত্তি ও আশঙ্কা কাটাইয়া সম্পূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে গৌরব সবই কপিলেরই প্রাপ্য। প্রায়-সম্পূর্ণ অট্টালিকাকে সম্পূর্ণ করা অতি সহজ কায।

---

*কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদের মধ্যে সাধারণ তত্ত্ব আবিষ্কার করাকে generalisation বা সামান্যী-করণ বলে।

তৃতীয় অধ্যায়।

সাংখ্য ও অদ্বৈত।

আমি প্রথমে আপনাদের নিকট যে সাংখ্য দর্শনের আলোচনা করিতেছিলাম, তাহার মোট কথাগুলি সংক্ষেপে বলিব। কারণ, এই বক্তৃতায় আমরা ইহার অসম্পূর্ণতা কোন্‌গুলি, তাহা বাহির করিতে এবং বেদান্ত আসিয়া কিরূপে ঐ অসম্পূর্ণতাগুলি সম্পূ করিয়া দেন, তাহা বুঝিতে চাই। আপনাদের অবশ্যই স্মরণ আছে যে, সাংখ্য দর্শনের মতে প্রকৃতি হইতেই চিন্তা, বুদ্ধি, বিচার, রাগ, দ্বেষ, স্পর্শ, রস—এক কথায় সমুদয় বিকাশ হইতেছে। এই প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামক তিন প্রকার উপাদানে গঠিত। এগুলি গুণ নহে, জগতের উপাদান-কারণ—এইগুলি হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইতেছে আর যুগপ্রারম্ভে এগুলি সামঞ্জস্য-ভাবে বা সাম্যাবস্থায় থাকে। সৃষ্টি আরম্ভ হইলেই এই সাম্যা-বস্থা ভঙ্গ হয়, তখন এই দ্রব্যগুলি পরস্পর নানারূপে মিলিত হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে। ইহাদের প্রথম বিকাশকে সাংখ্যেরা মহৎ (অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী বুদ্ধি) বলেন। আর তাহা হইতে অহংজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। অহংজ্ঞান হইতে মন অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী মনস্তত্ত্বের উদ্ভব। ঐ অহংজ্ঞান বা অহঙ্কার হইতেই জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং তন্মাত্রা অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রস প্রভৃতির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণুর উৎপত্তি হয়। এই অহঙ্কার হইতেই

সমুদয় সূক্ষ্ম পরমাণুর উদ্ভব, আর ঐ সূক্ষ্ম পরমাণুসমূহ হইতেই স্থূল পরমাণুসমূহের উৎপত্তি হয়, যাহাকে আমরা জড় বলি। তন্মাত্রার (অর্থাৎ যে সকল পরমাণু দেখা যায় না বা যাহাদের পরিমাণ করা যায় না,) পর স্থূল পরমাণু সকলের উৎপত্তি—যাহাদিগকে আমরা অনুভব ও ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারি। বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন এই ত্রিবিধ কার্য্যসমন্বিত চিত্ত, প্রাণনামক শক্তিসমূহকে সৃষ্টি করিয়া উহাদিগকে পরিচালিত করিতেছে। এই প্রাণের সহিত শ্বাসপ্রশ্বাসের কোন সম্বন্ধ নাই, আপনাদের ঐ ধারণা এখনই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। শ্বাসপ্রশ্বাস প্রাণ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী শক্তির একটী কার্য্য মাত্র। কিন্তু এখানে 'প্রাণসমূহ' অর্থে সেই স্নায়বীয় শক্তিসমূহ বুঝায়, যাহারা সমুদয় দেহটীকে চালাইতেছে এবং চিন্তা ও দেহের নানাবিধ ক্রিয়ারূপে প্রকাশ পাইতেছে। শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি এই প্রাণসমূহের প্রধান ও প্রত্যক্ষতম প্রকাশ। যদি বায়ু দ্বারাই এই শ্বাসপ্রশ্বাসকার্য্য হইত, তবে মৃত ব্যক্তিও শ্বাসপ্রশ্বাসকার্য্য করিত। প্রাণই বায়ুর উপর কার্য্য করিতেছে, বায়ু প্রাণের উপর করিতেছে না। এই প্রাণসমূহ জীবনশক্তিস্বরূপ সমুদয় শরীরের উপর কার্য্য করিতেছে, উহারা আবার মন এবং ইন্দ্রিয়গণ (অর্থাৎ দুই প্রকার কেন্দ্র) দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। এ পর্য্যন্ত বেশ কথা। মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ খুব স্পষ্ট ও পরিষ্কার, আর ভাবিয়া দেখুন, কত যুগ পূর্ব্বে এই তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে —ইহা জগতের মধ্যে প্রাচীনতম যুক্তিসিদ্ধ চিন্তাপ্রণালী।

যেখানেই কোনরূপ দর্শন বা যুক্তিসিদ্ধ চিন্তাপ্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কপিলের নিকট কিছু না কিছু ঋণী। যেখানেই মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের কিছু না কিছু চেষ্টা হইয়াছে, সেখানেই এই চিন্তাপ্রণালীর জনক, এই কপিলনামধেয় ব্যক্তির নিকট তাহা ঋণী—দেখিতে পাওয়া যায়।

এতদূর পর্য্যন্ত আমরা দেখিলাম যে, এই মনোবিজ্ঞান বড়ই অপূর্ব্ব, কিন্তু আমরা যত অগ্রসর হইব, তত দেখিব, কোন কোন বিষয়ে ইহার সহিত আমাদিগের বিভিন্ন মত অবলম্বন করিতে হইবে। কপিলের প্রধান মত—পরিণাম। তিনি বলেন, এক বস্তু অপর বস্তুর পরিণাম বা বিকারস্বরূপ, কারণ, তাঁহার মতে কার্য্যকারণভাবের লক্ষণ এই যে,—কার্য্য অন্যরূপে পরিণত কারণ মাত্র।* আর যেহেতু আমরা যতদূর দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে সমগ্র জগৎই ক্রমাগত পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড নিশ্চিত কোন উপাদান হইতে অর্থাৎ প্রকৃতির পরিণামে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং উহা উহার কারণ হইতে স্বরূপতঃ কখন বিভিন্ন হইতে পারে না, কেবল যখন উহা বিশিষ্ট আকার ধারণ করে, তখন উহা সীমাবিশিষ্ট হয়। ঐ উপাদানটী স্বয়ং নিরাকার। কিন্তু কপিলের মতে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে বৈষম্যপ্রাপ্তির শেষ সোপান পর্য্যন্ত কোনটীই পুরুষ অর্থাৎ ভোক্তা বা প্রকাশকের সহিত সমান নহে। একটা কাদার

* কারণভাবাচ্চ।

—সাংখ্যসূত্র।১।১১৮।

তাল যেমন, মনসমষ্টিও তদ্রূপ, সমগ্র জগৎও সেইরূপ। স্বরূপতঃ উহাদের চৈতন্য নাই, কিন্তু উহাদের মধ্যে আমরা বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞান দেখিতে পাই, অতএব উহাদের পশ্চাতে—সমগ্র প্রকৃতির পশ্চাতে—নিশ্চিত এমন কোন সত্তা আছে, যাহার আলোক উহার উপর পড়িয়া, মহৎ, অহংজ্ঞান ও এই সব নানাবস্তুরূপে প্রতীত হইতেছে। আর এই সত্তাকেই কপিল পুরুষ বা আত্মা বলেন, বেদান্তীরাও উহাকে আত্মা বলিয়া থাকেন। কপিলের মতে পুরুষ অমিশ্র পদার্থ—উহা যৌগিক পদার্থ নহে। উহাই এক মাত্র অজড় পদার্থ, আর সমুদয় প্রপঞ্চবিকারই জড়। পুরুষই একমাত্র জ্ঞাতা। মনে করুন, আমি একটা বোর্ড দেখিতেছি। প্রথমে বাহিরের যন্ত্রগুলি মস্তিষ্ককেন্দ্রে (কপিলের মতে ইন্দ্রিয়ে) ঐ বিষয়টীকে লইয়া আসিবে; উহা আবার ঐ কেন্দ্র হইতে মনে যাইয়া তাহার উপর আঘাত করিবে—মন উহাকে আবার অহংজ্ঞানরূপ অপর একটী পদার্থে আবৃত করিয়া মহৎ বা বুদ্ধির নিকট সমর্পণ করিবে। কিন্তু মহতের স্বয়ং কার্য্যের শক্তি নাই—উহার পশ্চাতে যে পুরুষ রহিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত পক্ষে কর্ত্তা। এই গুলি সবই তাঁহার ভৃত্যস্বরূপে বিষয়ের আঘাত তাঁহার নিকট আনিয়া দেয়, তিনি তখন আদেশ দিলে মহৎ প্রতিঘাত বা প্রতিক্রিয়া করে। পুরুষই ভোক্তা, বোদ্ধা, যথার্থ সত্তা, সিংহাসনোপবিষ্ট রাজা, মানবের আত্মা আর তিনি অজড়। যেহেতু তিনি অজড়, সেহেতু তিনি অবশ্যই অনন্ত, তাঁহার কোনরূপ সীমা থাকিতে পারে না। সুতরাং ঐ

পুরুষগণের প্রত্যেকেই সর্ব্বব্যাপী, তবে কেবল সূক্ষ্ম ও স্থূল জড় পদার্থের মধ্য দিয়া কার্য্য করিতে পারেন। মন, অহংজ্ঞান, মস্তিষ্ককেন্দ্র বা ইন্দ্রিয়গণ এবং প্রাণ এই কয়েকটা লইয়া সূক্ষ্ম শরীর অথবা খ্রীষ্টীয় দর্শনে যাহাকে মানবের 'আধ্যাত্মিক দেহ' বলে, তাহা গঠিত। এই দেহেরই পুরস্কার বা দণ্ড হয়, ইহাই বিভিন্ন স্বর্গে যাইয়া থাকে, ইহারই বারবার জন্ম হয়। কারণ, আমরা প্রথম হইতেই দেখিয়া আসিয়াছি, পুরুষ বা আত্মার পক্ষে আসা যাওয়া অসম্ভব। গতি অর্থে যাওয়া আসা, আর যাহা একস্থান হইতে অপর স্থানে গমন করে, তাহা কখন সর্ব্বব্যাপী হইতে পারে না। এই লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্ম শরীরই আসে যায়। এই পর্য্যন্ত আমরা কপিলের দর্শন হইতে দেখিলাম যে, আত্মা অনন্ত আর একমাত্র উহাই প্রকৃতির পরিণাম নহে। একমাত্র উহাই প্রকৃতির বাহিরে, কিন্তু উহা প্রকৃতিতে বদ্ধ হইয়াছে বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। প্রকৃতি পুরুষকে বেড়িয়া আছে, সেই জন্য পুরুষ আপনাকে প্রকৃতির সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিয়াছেন। পুরুষ ভাবিতেছেন, 'আমি লিঙ্গশরীর' 'আমি স্থূল শরীর', আর সেই জন্যই তিনি সুখদুঃখ ভোগ করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুখ-দুঃখ আত্মার নহে, উহারা লিঙ্গশরীরের এবং স্থূল শরীরের। যখন কতকগুলি স্নায়ু আঘাতপ্রাপ্ত হয়, আমরা কষ্ট অনুভব করিয়া থাকি। আমরা উহা তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করিয়া থাকি। যদি আমার অঙ্গুলির স্নায়ুগুলি নষ্ট হয়, তবে আমরা অঙ্গুলি কাটিয়া ফেলিলেও উহা বোধ করিব না। অতএব সুখদুঃখ স্নায়ুকেন্দ্রসমূহের। মনে

করুন, আমার দর্শনেন্দ্রিয় নষ্ট হইল, তাহা হইলে আমার চক্ষুযন্ত্র থাকিলেও আমি রূপ হইতে কোন সুখদুঃখ অনুভব করিব না। অতএব ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সুখদুঃখ আত্মার নহে; উহারা মন ও দেহের।

আত্মার সুখদুঃখ কিছুই নাই, উহা সকল বিষয়ের সাক্ষিস্বরূপ, যাহা কিছু হইতেছে, তাহারই নিত্য সাক্ষিস্বরূপ, কিন্তু উহা কোন কর্ম্মের কোনরূপ ফল গ্রহণ করে না।

সূর্য্য যেমন সকল লোকের চক্ষের দৃষ্টির কারণ হইলেও স্বয়ং কোন চক্ষের দোষে লিপ্ত হয় না, পুরুষও তদ্রূপ।*

"যেমন একখণ্ড স্ফটিকের সম্মুখে লাল ফুল রাখিলে উহা লাল দেখায়, এইরূপ পুরুষকেও প্রকৃতির প্রতিবিম্ব দ্বারা সুখ-দুঃখে লিপ্ত বোধ হয়, কিন্তু উহা সদাই অপরিণামী।"†

উহার অবস্থা যতটা সম্ভব কাছাকাছি বর্ণনা করিতে গেলে বলিতে হয়, ধ্যানকালে আমরা যে ভাব অনুভব করি, উহা প্রায় তদ্রূপ। এই ধ্যানাবস্থায়ই আপনারা পুরুষের খুব সন্নিহিত হইয়া থাকেন। অতএব আমরা দেখিতেছি, যোগীরা এই ধ্যানাবস্থাকে কেন সর্ব্বোচ্চ অবস্থা বলিয়া থাকেন; কারণ, পুরুষের সহিত আপনার এই একত্ববোধ—জড়াবস্থা বা ক্রিয়াশীল অবস্থা নহে, উহা ধ্যানাবস্থা। ইহাই সাংখ্যদর্শন।

---

* কঠোপনিষদ্—২য় বল্লী, ২য় অধ্যায়, ২২ শ্লোক দেখ।

† কুসুমবচ্চ মণিঃ।

—সাংখ্যসূত্র।২।৩৫।

তার পর সাংখ্যেরা আরো বলেন যে, প্রকৃতির এই সকল বিকার আত্মার জন্য, উহার বিভিন্ন উপাদানের সম্মিলনাদি সমস্তই উহা হইতে স্বতন্ত্র অপর কাহারও জন্য। সুতরাং এই যে নানাবিধ মিশ্রণকে আমরা প্রকৃতি বা জগৎপ্রপঞ্চ বলি—এই যে আমাদের ভিতরে এবং চতুর্দ্দিকে ক্রমাগত পরিবর্ত্তনপরম্পরা হইতেছে, তাহা আত্মার ভোগ ও অপবর্গ বা মুক্তির জন্য। আত্মা সর্ব্ব-নিম্ন অবস্থা হইতে সর্ব্বোচ্চ অবস্থা পর্য্যন্ত স্বয়ং ভোগ করিয়া তাহা হইতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারেন, আর যখন আত্মা এই অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে, তিনি কোন কালেই প্রকৃতিতে বদ্ধ ছিলেন না, তিনি সর্ব্বদাই উহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন—তখন তিনি আরো দেখিতে পান যে, তিনি অবিনাশী, তাঁহার আসা যাওয়া কিছুই নাই, স্বর্গে যাওয়া আবার এখানে আসিয়া জন্মান—সমুদয়ই প্রকৃতির—তাঁহার নিজের নহে। তখনই আত্মা মুক্ত হইয়া যান। এই-রূপে সমুদয় প্রকৃতি আত্মার ভোগ বা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য কার্য্য করিয়া যাইতেছে, আর আত্মা, সেই চরম লক্ষ্যে যাইবার জন্য এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছেন। আর মুক্তিই এই চরম লক্ষ্য। সাংখ্যদর্শনের মতে এই আত্মার সংখ্যা বহু। অনন্তসংখ্যক আত্মা রহিয়াছেন। উহার আর একটী সিদ্ধান্ত এই যে, ঈশ্বর নাই, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কেহ নাই। সাংখ্যেরা বলেন, প্রকৃতিই যখন এই সকল বিভিন্ন রূপ সৃজন করিতে সমর্থ, তখন ঈশ্বর স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই।

এক্ষণে আমাদিগকে সাংখ্যদিগের এই তিনটী মত খণ্ডন করিতে হইবে। প্রথমটী এই যে, জ্ঞান বা ঐরূপ যাহা কিছু তাহা আত্মার নহে, উহা সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির অধিকারে, আত্মা নির্গুণ ও অরূপ। সাংখ্যের দ্বিতীয় মত যাহা আমরা খণ্ডন করিব, তাহা এই যে, ঈশ্বর নাই—বেদান্ত দেখাইবেন, ঈশ্বর স্বীকার না করিলে জগতের কোনপ্রকার ব্যাখ্যাই হইতে পায় না। তৃতীয়তঃ, আমাদিগকে দেখাইতে হইবে যে, বহু আত্মা থাকিতে পারে না, আত্মা অনন্তসংখ্যক হইতে পারে না, জগদ্ব্রহ্মাণ্ডে এক আত্মা আছেন মাত্র—আর সেই একই বহুরূপে প্রতীত হইতেছে।

প্রথমে আমরা সাংখ্যের ঐ প্রথম সিদ্ধান্তটী লইয়া আলোচনা করিব যে, জ্ঞানচৈতন্য সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির অধিকারে, আত্মার জ্ঞানচৈতন্য নাই। বেদান্ত বলেন, আত্মার স্বরূপ অসীম অর্থাৎ তিনি পূর্ণ সত্তা জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। তবে আমাদের সাংখ্যের সহিত এই বিষয়ে একমত যে, তাঁহারা যাহাকে জ্ঞান বলেন, তাহা একটী যৌগিক পদার্থ মাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের বিষয়ানুভূতি কিরূপে হয়, সেই ব্যাপারটী আলোচনা করা যাউক। আমাদের স্মরণ আছে যে, চিত্তই বাহিরের বিভিন্ন বস্তুকে লইতেছে, উহারই উপর বহির্বিষয়ের আঘাত আসিয়াছে এবং উহা হইতেই প্রতিক্রিয়া হইতেছে। মনে করুন, বাহিরে কোন বস্তু রহিয়াছে। আমি একটী বোর্ড দেখিতেছি। উহার জ্ঞান কিরূপে হইতেছে? বোর্ডটীর স্বরূপ অজ্ঞাত, আমরা কখনই উহাকে জানিতে পারি না। জর্ম্মান দার্শনিকেরা উহাকে 'বস্তুর স্বরূপ'

(Thing in itself) বলিয়া থাকেন। সেই বোর্ড স্বরূপতঃ যাহা, সেই অজ্ঞেয় সত্তা 'ক' আমার চিত্তের উপর কার্য্য করিতেছে, আর চিত্ত প্রতিক্রিয়া করিতেছে। চিত্ত একটী হ্রদের মত। যদি হ্রদের উপর আপনি একটী প্রস্তর নিক্ষেপ করেন, যখনই প্রস্তর ঐ হ্রদের উপর আঘাত করে, তখনই প্রস্তরের দিকে হ্রদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপে একটী তরঙ্গ আসিবে। আপনারা বিষয়ানুভূতিকালে বাস্তবিক এই তরঙ্গটীকেই দেখিয়া থাকেন। আর ঐ তরঙ্গটী আদতেই সেই প্রস্তরটীর মত নয়—উহা একটী তরঙ্গ। অতএব সেই যথার্থ বোর্ড 'ক'ই প্রস্তররূপে মনের উপর আঘাত করিতেছে, আর মন সেই আঘাতকারী পদার্থের দিকে একটী তরঙ্গ নিক্ষেপ করিতেছে। উহার দিকে এই যে তরঙ্গ নিক্ষিপ্ত হইতেছে, তাহাকেই আমরা বোর্ড নামে অভিহিত করিয়া থাকি। আমি আপনাকে দেখিতেছি। আপনি স্বরূপতঃ যাহা, তাহা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। আপনি সেই অজ্ঞাত সত্তা 'ক'স্বরূপ, আপনি আমার মনের উপর কার্য্য করিতেছেন, আর মন যে দিক্ হইতে ঐ কার্য্য হইয়াছিল, তাহার দিকে একটী তরঙ্গ নিক্ষেপ করে, আর সেই তরঙ্গকেই আমরা অমুক নর বা অমুক নারী বলিয়া থাকি।

এই জ্ঞানক্রিয়ার দুইটী উপাদান—তন্মধ্যে একটী ভিতর হইতে ও অপরটী বাহির হইতে আসিতেছে, আর এই দুইটীর মিশ্রণ (ক + মন) আমাদের বাহ্য জগৎ। সমুদয় জ্ঞান প্রতিক্রিয়ার ফল। তিমি মৎস্য সম্বন্ধে গণনা দ্বারা স্থির করা হইয়াছে যে,

উহার লেজে আঘাত করিবার কতক্ষণ পরে উহার মন ঐ লেজের উপর প্রতিক্রিয়া করে ও ঐ লেজে কষ্ট অনুভব হয়। শুক্তির কথা ধরুন, একটী বালুকাকণা * ঐ শুক্তির খোলার ভিতর প্রবেশ করিয়া উহাকে উত্তেজিত করিতে থাকে—তখন ঐ শুক্তি বালুকাকণার চতুর্দ্দিকে নিজ রস প্রক্ষেপ করে—তাহাতেই মুক্তা উৎপন্ন হয়। দুটী জিনিষে মুক্তা প্রস্তুত হইতেছে। প্রথমতঃ, শুক্তির শরীরনিঃসৃত রস, আর দ্বিতীয়তঃ, বহির্দ্দেশ হইতে প্রদত্ত আঘাত। আমার এই টেবিলটীর জ্ঞানও তদ্রূপ—'ক' + মন। ঐ বস্তুকে জানিবার চেষ্টাটা ত মনই করিবে; সুতরাং মন উহাকে বুঝিবার জন্য নিজের সত্তা কতকটা উহাতে প্রদান করিবে, আর যখনই আমরা উহা জানিলাম, তখনই উহা একটী যৌগিক পদার্থ হইয়া দাঁড়াইল 'ক' + মন। আভ্যন্তরিক অনুভূতি সম্বন্ধে অর্থাৎ যখন আমরা নিজেকে জানিতে ইচ্ছা করি, তখনও ঐরূপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। যথার্থ আত্মা বা আমি, যাহা আমাদের ভিতরে রহিয়াছে, তাহাও অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। উহাকে 'খ' বলা যাক্। যখন আমি আমাকে অমুক ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া জানিতে চাই, তখন ঐ 'খ', 'খ' + মন এইরূপে প্রতীত হয়। যখন আমি আমাকে জানিতে চাই,

* বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মতে বালুকাকণা হইতে মুক্তার উৎপত্তি—এই লোকপ্রচলিত বিশ্বাসটীর কোন ভিত্তি নাই। সম্ভবতঃ ক্ষুদ্রকীটাণুবিশেষ (Parasite) হইতে মুক্তার উৎপত্তি।

তখন ঐ 'খ' মনের উপর একটী আঘাত করে, মনও আবার ঐ 'খ' এর উপর আঘাত করিয়া থাকে। অতএব আমাদের সমগ্র জগতের জ্ঞানকে 'ক'+মন (বাহ্য জগৎ) এবং 'খ'+মন (অন্তর্জ্জগত) রূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আমরা পরে দেখিব, অদ্বৈতবাদীদের সিদ্ধান্ত কিরূপে গণিতের ন্যায় প্রমাণিত করা যাইতে পারে।

'ক' ও 'খ' কেবল বীজগণিতের অজ্ঞাত সংখ্যামাত্র। আমরা দেখিয়াছি, সকল জ্ঞানই যৌগিক—বাহ্য জগৎ বা ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞানও যৌগিক এবং বুদ্ধি বা অহংজ্ঞানও তদ্রূপ একটী যৌগিক ব্যাপার। যদি উহা ভিতরের জ্ঞান বা মানসিক অনুভূতি হয়, তবে উহা 'খ'+মন, আর যদি উহা বাহিরের জ্ঞান বা বিষয়ানুভূতি হয়, তবে উহা 'ক'+মন। সমুদয় ভিতরের জ্ঞান 'খ' এব সহিত মনের সংযোগলব্ধ এবং বাহিরের জড় পদার্থের সমুদয় জ্ঞান 'ক' এর সহিত মনের সংযোগের ফল। প্রথমে ভিতরের ব্যাপারটী গ্রহণ করিলাম। আমরা প্রকৃতিতে যে জ্ঞান দেখিতে পাই, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক হইতে পারে না, কারণ, জ্ঞান—'খ' ও মনের সংযোগলব্ধ আর ঐ 'খ' আত্মা হইতে আসিতেছে। অতএব আমরা যে জ্ঞানের সহিত পরিচিত, তাহা আত্মচৈতন্যের শক্তির সহিত প্রকৃতির সংযোগের ফল। এইরূপ আমরা বাহিরের সত্তা যাহা জানিতেছি, তাহাও অবশ্য মনের সহিত 'ক' এর সংযোগোৎপন্ন। অতএব আমরা দেখিতেছি, আমি আছি, আমি জানিতেছি, ও আমি সুখী (অর্থাৎ সময়ে সময়ে আমাদের যে ভাব

আসে যে, আমার কোন অভাব নাই) এই তিনটী তত্ত্বে আমাদের জীবনের কেন্দ্রগত ভাব, আমাদের জীবনের মহান্ ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, আর ঐ কেন্দ্র বা ভিত্তি সীমাবিশিষ্ট হইয়া অপরবস্তুসংযোগে যৌগিক ভাব ধারণ করিলে আমরা উহাকে সুখ বা দুঃখ নামে অভিহিত করিয়া থাকি। এই তিনটী তত্ত্বই ব্যবহারিক সত্তা, ব্যবহারিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক আনন্দ বা প্রেমরূপে প্রকাশিত হইতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই অস্তিত্ব আছে, প্রত্যেককেই জানিতে হইবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই আনন্দের জন্য হইয়াছে। ইহা অতিক্রম করিবার সাধ্য তাহার নাই। সমগ্র জগতেই এইরূপ। পশুগণ ও উদ্ভিদ্‌গণ, অতি নিম্নতম হইতে অতি উচ্চতম সত্তা পর্য্যন্ত সকলেই ভালবাসিয়া থাকে। আপনারা উহাকে ভালবাসা না বলিতে পারেন, কিন্তু তাহারা অবশ্যই সকলে জগতে থাকিবে, সকলকেই জানিতে হইবে, সকলকেই ভালবাসিতে হইবে। অতএব এই যে সত্তা আমরা জানিতেছি, তাহা পূর্ব্বোক্ত 'ক' ও মনের সংযোগফল আর আমাদের জ্ঞানও সেই ভিতরের 'খ' ও মনের সংযোগফল আর প্রেমও ঐ 'খ' ও মনের সংযোগফল। অতএব এই যে তিনটী বস্তু বা তত্ত্ব ভিতর হইতে আসিয়া বাহিরের বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়া ব্যবহারিক সত্তা, ব্যবহারিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক প্রেমের সৃষ্টি করিতেছে, তাহাদিগকেই বৈদান্তিকেরা নিরপেক্ষ বা পারমার্থিক সত্তা, পারমার্থিক জ্ঞান ও পারমার্থিক আনন্দ বলিয়া থাকেন।

সেই পারমার্থিক সত্তা, যাহা অসীম, অমিশ্র, অযৌগিক, যাহার

কোন পরিণাম নাই, তাহাই সেই মুক্ত আত্মা, আর যখন সেই প্রকৃত সত্তা প্রাকৃতিক বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়া যেন মলিন হইয়া যায়, তাহাকেই আমরা* মানব নামে অভিহিত করি। উহা সীমাবদ্ধ হইয়া উদ্ভিদ্‌জীবন, পশুজীবন, মানবজীবন রূপে প্রকাশিত হয়। যেমন অনন্ত দেশ এই গৃহের দেয়াল বা অন্য কোনরূপ বেষ্টনের দ্বারা আপাততঃ সীমাবদ্ধ বোধ হয়। সেই পারমার্থিক জ্ঞান বলিতে যে জ্ঞানের বিষয় আমরা জানি, তাহাকে বুঝায় না—বুদ্ধি বা বিচারশক্তি বা সহজাত জ্ঞান কিছুই বুঝায় না, উহা সেই বস্তুকে বুঝায়, যাহা বিভিন্নাকারে প্রকাশিত হইলে আমরা এই সকল বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়া থাকি। যখন সেই নিরপেক্ষ বা পূর্ণজ্ঞান সীমাবদ্ধ হয়, তখন আমরা উহাকে দিব্য বা প্রাতিভ জ্ঞান বলি,—যখন আরো অধিক সীমাবদ্ধ হয়, তখন উহাকে যুক্তি-বিচার, সহজাত জ্ঞান ইত্যাদি নাম দিয়া থাকি। সেই নিরপেক্ষ জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে। উহাকে সর্ব্বজ্ঞতা বলিলেও উহার ভাব অনেকটা প্রকাশ হইতে পারে। উহা কোন প্রকার যৌগিক পদার্থ নহে। উহা আত্মার স্বভাব। যখন সেই নিরপেক্ষ প্রেম সীমাবদ্ধ ভাব ধারণ করে, তখনই উহাকে আমরা প্রেম বলি—যাহা স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর বা ভাবসমূহের প্রতি আকর্ষণস্বরূপ। এই-গুলি সেই আনন্দের বিকৃত প্রকাশ মাত্র আর ঐ আনন্দ আত্মার গুণবিশেষ নহে, উহা আত্মার স্বরূপ—উহার আভ্যন্তরিক প্রকৃতি। নিরপেক্ষ সত্তা, নিরপেক্ষ জ্ঞান ও নিরপেক্ষ আনন্দ আত্মার গুণ নহে, উহারা আত্মার স্বরূপ, উহাদের সহিত আত্মার

কোন প্রভেদ নাই। আর ঐ তিনটী একই জিনিষ, আমরা এক বস্তুকে তিন বিভিন্ন ভাবে দেখিয়া থাকি মাত্র। উহারা সমুদয় সাধারণ জ্ঞানের অতীত, আর তাহাদের প্রতিবিম্বেই প্রকৃতিকে চৈতন্যবান্ বলিয়া বোধ হয়।

আত্মার সেই নিত্য নিরপেক্ষ জ্ঞানই মানবমনের মধ্য দিয়া আসিয়া আমাদের বিচার যুক্তি বুদ্ধি হইয়াছে। যে উপাধি বা মধ্যবর্ত্তীর মধ্য দিয়া উহা প্রকাশ পায়, তাহার বিভিন্নতা অনুসারে উহার বিভিন্নতা হয়। আত্মা হিসাবে আমাতে এবং অতি ক্ষুদ্রতম প্রাণীতে কোন প্রভেদ নাই, কেবল তাহার মস্তিষ্ক জ্ঞানপ্রকাশের অপেক্ষাকৃত অনুপযোগী যন্ত্র, এই জন্য তাহার জ্ঞানকে আমরা সহজাত জ্ঞান বলিয়া থাকি। মানবের মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মতর ও জ্ঞান প্রকাশের উপযোগী,সেইজন্য তাহার নিকট জ্ঞানের প্রকাশ স্পষ্টতর, আর উচ্চতম মানবে উহা একখণ্ড কাচের ন্যায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে। অস্তিত্ব বা সত্তা সম্বন্ধেও তদ্রূপ ; আমরা যে অস্তিত্বটাকে জানি, এই সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র অস্তিত্বটা সেই নিরপেক্ষ সত্তার প্রতিবিম্ব মাত্র, আর উহা আত্মার স্বরূপ। আনন্দ সম্বন্ধেও এইরূপ ; যাহাকে আমরা প্রেম বা আকর্ষণ বলি, তাহা সেই আত্মার নিত্য আনন্দের প্রতিবিম্বস্বরূপ, কারণ, যেমন ব্যক্তভাব বা প্রকাশ হইতে থাকে, অমনি সসীমতা আসিয়া থাকে, কিন্তু আত্মার সেই অব্যক্ত, স্বাভাবিক, স্বরূপগত সত্তা অসীম ও অনন্ত, সেই আনন্দের সীমা নাই। কিন্তু মানবীয় প্রেমে সীমা আছে। আমি আজ আপনাকে ভালবাসিলাম, তার পর দিনই আমি আপ-

নাকে আর ভালবাসিতে না পারি। একদিন আমার ভালবাসা বাড়িয়া উঠিল, তার পর দিন আবার কমিয়া গেল, কারণ, উহা একটী সীমাবদ্ধ প্রকাশমাত্র। অতএব কপিলের মতের বিরুদ্ধে এই প্রথম কথা পাইলাম যে, তিনি আত্মাকে নির্গুণ, অরূপ, নিষ্ক্রিয় পদার্থ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু বেদান্ত উপদেশ দিতেছেন যে, উহা সমুদয় সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দের সারস্বরূপ, আমরা যতপ্রকার জ্ঞানের বিষয় জানি, তিনি তাহা হইতে অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠতর, আমরা মানবীয় প্রেম বা আনন্দের যতদূর পর্য্যন্ত কল্পনা করিতে পারি, তিনি তাহা হইতে অনন্তগুণে অধিক আনন্দ-ময়, আর তিনি অনন্ত সত্তাবান্। আত্মার কখন মৃত্যু হয় না। আত্মার সম্বন্ধে জন্মমরণের কথা ভাবিতেই পারা যায় না, কারণ, তিনি অনন্ত সত্তাস্বরূপ।

কপিলের সহিত আমাদের দ্বিতীয় বিষয়ে বিবাদ—তাঁহার ঈশ্বরবিষয়ক ধারণা লইয়া। যেমন ব্যষ্টি বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যষ্টি শরীর পর্য্যন্ত এই প্রাকৃতিক সান্ত প্রকাশশ্রেণীর পশ্চাতে উহাদের নিয়ন্তা ও শাস্তা স্বরূপ আত্মা স্বীকারের প্রয়োজন, সমষ্টিতেও—বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডেও—সমষ্টি বুদ্ধি, সমষ্টি মন, সমষ্টি সূক্ষ্ম ও স্থূল জড়ের পশ্চাতে তাহাদের নিয়ন্তা ও শাস্তাস্বরূপে কে আছেন, আমরা তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিব। এই সমষ্টি বুদ্ধ্যাদি শ্রেণীর পশ্চাতে উহাদের নিয়ন্তা ও শাস্তাস্বরূপ একজন সর্ব্বব্যাপী আত্মা স্বীকার না করিলে ঐ শ্রেণী সম্পূর্ণ হইবে কিরূপে? যদি আমরা সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের একজন শাস্তা আছেন, এ কথা

অস্বীকার করি, তাহা হইলে ঐ ক্ষুদ্রতর শ্রেণীর পশ্চাতেও যে একজন আত্মা আছেন, ইহাও অস্বীকার করিতে হইবে ; কারণ, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড একই নির্ম্মাণপ্রণালীর পৌনঃপুনিকতা মাত্র। আমরা একতাল মাটিকে জানিতে পারিলে সকল মৃত্তিকার স্বরূপ জানিতে পারিব। যদি আমরা একটী মানবকে বিশ্লেষণ করিতে পারি, তবে সমগ্র জগৎকে বিশ্লেষণ করা হইল ; কারণ, উহারা একই নিয়মে নির্ম্মিত। অতএব যদি ইহা সত্য হয় যে, এই ব্যষ্টি শ্রেণীর পশ্চাতে এমন একজন আছেন, যিনি সমুদয় প্রকৃতির অতীত, যিনি কোনরূপ উপাদানে নির্ম্মিত নহেন অর্থাৎ পুরুষ—তাহা হইলে ঐ একই যুক্তি, সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের উপরও খাটিবে এবং উহার পশ্চাতেও একটী চৈতন্য স্বীকারের প্রয়োজন হইবে। যে সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য প্রকৃতির সমুদয় বিকারের পশ্চাদ্দেশে রহিয়াছে, তাহাকে বেদান্ত সকলের নিয়ন্তা ঈশ্বর বলেন।

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত দুইটী বিষয় হইতে গুরুতর বিষয় লইয়া সাংখ্যের সহিত আমাদিগকে বিবাদ করিতে হইবে। বেদান্তের মত এই যে, আত্মা একটীমাত্রই থাকিতে পারেন। আমরা বিবাদের প্রারম্ভেই সাংখ্যেরই মত লইয়া—যেহেতু আত্মা অপর কোন বস্তু হইতে গঠিত নহে, সেই হেতু প্রত্যেক আত্মা অবশ্যই সর্ব্বব্যাপী হইবে, ইহা প্রমাণ করিয়া—উঁহাদিগকে বেশ ধাক্কা দিতে পারি। যে কোন বস্তু সীমাবদ্ধ, তাহা অপর কিছুর দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই টেবিলটী রহিয়াছে—ইহার অস্তিত্ব অনেক বস্তুর দ্বারা সীমাবদ্ধ, আর সীমাবদ্ধ বস্তু বলিলেই পূর্ব্ব হইতে

এমন একটী বস্তুর কল্পনা করিতে হয়, যাহা উহাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে। যদি আমরা 'দেশ' সম্বন্ধে চিন্তা করিতে যাই, তবে আমাদিগকে উহাকে একটী ক্ষুদ্র বৃত্তের মত চিন্তা করিতে হয়, কিন্তু তাহারও বহির্দ্দেশে আরও 'দেশ' রহিয়াছে। আমরা অন্য কোন উপায়ে সীমাবদ্ধ 'দেশের' বিষয় কল্পনা করিতে পারি না। উহাকে কেবল অনন্তের মধ্য দিয়াই বুঝা ও অনুভব করা যাইতে পারে। সসীমকে অনুভব করিতে হইলে সর্ব্বস্থলেই আমাদিগকে অসীমের উপলব্ধি করিতে হয়। হয় দুইটীই স্বীকার করিতে হয়, নতুবা কোনটীকেই স্বীকার করা চলে না। যখন আপনারা কাল সম্বন্ধে চিন্তা করেন, তখন আপনাদিগকে নির্দ্দিষ্ট একটা কালের অতীত কাল সম্বন্ধেও চিন্তা করিতে হয়। উহাদের একটী সীমাবদ্ধ কাল, আর বৃহত্তরটী অসীম কাল। যখনই আপনারা সসীমকে অনুভব করিবার চেষ্টা করিবেন, তখনই দেখিবেন, উহাকে অসীম হইতে পৃথক্ করা অসম্ভব। যদি তাহাই হয়, তবে আমরা তাহা হইতেই প্রমাণ করিব যে, এই আত্মা অসীম ও সর্ব্বব্যাপী। এখন একটী গভীর সমস্যা আসিতেছে। সর্ব্বব্যাপী ও অনন্ত পদার্থ কি দুইটী হইতে পারে? মনে করুন, অসীম বস্তু দুইটী হইল—তাহা হইলে, উহাদের মধ্যে একটী অপরটীকে সীমাবদ্ধ করিবে। মনে করুন, 'ক' ও 'খ' দুইটী অনন্ত বস্তু রহিয়াছে। তাহা হইলে অনন্ত 'ক' অনন্ত 'খ'কে সীমাবদ্ধ করিবে। কারণ, আপনি ইহা বলিতে পারেন যে, অনন্ত 'ক' অনন্ত 'খ' নহে, আবার অনন্ত 'খ' এর সম্বন্ধেও বলা

যাইতে পারে যে, উহা অনন্ত 'ক' নহে। অতএব অনন্ত একটীই থাকিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, অনন্তের ভাগ হইতে পারে না। অনন্তকে যত ভাগ করা যাক্ না কেন, তথাপি উহা অনন্তই হইবে; কারণ, উহাকে নিজ হইতে পৃথক্ করা যাইতে পারে না। মনে করুন, এক অনন্ত সমুদ্র রহিয়াছে, উহা হইতে কি আপনি এক ফোঁটাও জল লইতে পারেন? যদি পারিতেন, তাহা হইলে সমুদ্র আর অনন্ত থাকিত না, ঐ এক ফোঁটা জলই উহাকে সীমাবদ্ধ করিত। অনন্তকে কোন উপায়ে ভাগ করা যাইতে পারে না।

কিন্তু আত্মা যে এক, তাহার ইহা হইতেও প্রবলতর প্রমাণ আছে। শুধু তাহাই নহে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যে এক অখণ্ড সত্তা— ইহাও প্রমাণ করা যাইতে পারে। আর একবার আমরা পূর্ব্ব-কথিত 'ক' 'খ' নামক অজ্ঞাতবস্তুসূচক চিহ্নের সাহায্য গ্রহণ করিব। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, যাহাকে আমরা বহির্জ্জগৎ বলি, তাহা 'ক'+মন, আর অন্তর্জ্জগৎ—'খ'+মন। 'ক' ও 'খ' এই দুইটীই—অজ্ঞাতসংখ্যাবাচক—উভয়টীই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। এক্ষণে মন কি, দেখা যাক্। মন দেশকালনিমিত্ত ছাড়া আর কিছুই নহে—উহারাই মনের স্বরূপ। আপনারা কাল ব্যতীত কখন চিন্তা করিতে পারেন না, দেশ ব্যতীত কোন বস্তুর ধারণা করিতে পারেন না, এবং নিমিত্ত বা কার্য্যকারণ সম্বন্ধ ছাড়িয়া কোন বস্তুর কল্পনা করিতে পারেন না। পূর্ব্বোক্ত 'ক' ও 'খ', এই তিনটী ছাঁচে পড়িয়া মন দ্বারা সীমাবদ্ধ হইতেছে।

ঐগুলি ব্যতীত মনের স্বরূপ আর কিছুই নহে। এখন ঐ তিনটী ছাঁচ, যাহাদের স্বয়ং কোন অস্তিত্ব নাই, তাহাদিগকে তুলিয়া লউন। কি অবশিষ্ট থাকে? তখন সবই এক হইয়া যায়। 'ক' ও 'খ' এক বলিয়া বোধ হয়। কেবল এই মন, এই ছাঁচই উহাদিগকে আপাতদৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ করিয়াছিল এবং উহাদিগকে অন্তর্জ্জগৎ ও বাহ্যজগৎ এই দুইরূপে ভিন্ন করিয়াছিল। 'ক' ও 'খ' উভয়ই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। আমরা উহাদিগের উপর কোন গুণের আরোপ করিতে পারি না। সুতরাং গুণ বা বিশেষণ-রহিত বলিয়া ঐ উভয়ই এক। যাহা গুণরহিত ও নিরপেক্ষ পূর্ণ, তাহা অবশ্যই এক হইবে। নিরপেক্ষ পূর্ণ বস্তু দুইটী হইতে পারে না। যেখানে কোন গুণ নাই, সেখানে কেবল এক বস্তুই থাকিতে পারে। 'ক' ও 'খ' উভয়ই নির্গুণ, কারণ, উহারা কেবল মন হইতেই গুণ পাইতেছে। অতএব এই 'ক' ও 'খ' এক।

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এক অখণ্ড সত্তামাত্র। জগতে কেবল এক আত্মা, এক সত্তা আছে; আর সেই এক সত্তা, যখন দেশকাল-নিমিত্তের ছাঁচের মধ্যে পড়ে, তখনই তাহাকে বুদ্ধি, অহংজ্ঞান, সূক্ষ্ম ভূত, স্থূল ভূত আদি আখ্যা দেওয়া হয়। সমুদয় ভৌতিক ও মানসিক আকার বা রূপ, যাহা কিছু এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ডে আছে, তাহা সেই এক বস্তু—কেবল বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইতেছে মাত্র। যখন উহার একটু এই দেশকালনিমিত্তের জালে পড়ে, তখন উহা আকারগ্রহণ করে বলিয়া বোধ হয়—ঐ জাল সরাইয়া

দেখুন—সবই এক। এই সমগ্র জগৎ এক অখণ্ডস্বরূপ, আর উহাকেই অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে ব্রহ্ম বলে। ব্রহ্ম যখন ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাদ্দেশে আছেন বলিয়া প্রতীত হন, তখন তাঁহাকে ঈশ্বর বলে, আর যখন তিনি এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাতে বর্ত্তমান বলিয়া প্রতীত হন, তখন তাঁহাকে আত্মা বলে। অতএব এই আত্মাই মানবের অভ্যন্তরস্থ ঈশ্বর। একটীমাত্র পুরুষ আছেন—তাঁহাকে ঈশ্বর বলে, আর যখন ঈশ্বর ও মানব উভয়ের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়, তখন উভয়ই এক বলিয়া জানা যায়। এই ব্রহ্মাণ্ড আপনিই স্বয়ং, অবিভক্ত আপনি। আপনি এই সমগ্র জগতের মধ্যে রহিয়াছেন। "সকল হস্তে আপনি কার্য্য করিতেছেন, সকল মুখে আপনি খাইতেছেন, সকল নাসিকায়—আপনি শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলিতেছেন, সকল মনে আপনি চিন্তা করিতেছেন।"* সমগ্র জগৎই আপনি। এই ব্রহ্মাণ্ড আপনার শরীর। আপনিই ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগৎ উভয়ই; আপনিই জগতের আত্মা আবার আপনিই উহার শরীরও বটেন। আপনিই ঈশ্বর, আপনিই দেবতা, আপনিই মানুষ, আপনিই পশু, আপনিই উদ্ভিদ্, আপনিই খনিজ, আপনিই সব—সমুদয় ব্যক্ত জগৎই আপনি। যাহা কিছু আছে, সবই আপনি, যথার্থ 'আপনি' যাহা—সেই এক অবিভক্ত আত্মা—যে ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ ব্যক্তিবিশেষকে আপনি 'আপনি' বলিয়া মনে করেন, তাহা নহে।

এক্ষণে এই প্রশ্ন উঠিতেছে, আপনি অনন্ত পুরুষ হইয়া

* গীতা—১৩শ অধ্যায় দেখ।

কিরূপে এইরূপ খণ্ড খণ্ড হইলেন, অমুক রাম শ্যাম হরি, পশু পক্ষী ও অন্যান্য বস্তু হইলেন। ইহার উত্তর এই, এই সমুদয় বিভাগ আপাতপ্রতীয়মানমাত্র। আমরা জানি, অনন্তের কখন বিভাগ হইতে পারে না। অতএব আপনি একটা অংশমাত্র, একথা মিথ্যা, উহা কখনই সত্য হইতে পারে না। আর আপনি যে অমুক রাম, শ্যাম হরি, এ কথাও কোন কালে সত্য নহে, উহা কেবল স্বপ্নমাত্র! এইটী জানিয়া মুক্ত হউন। ইহাই অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত।

"আমি মনও নহি, দেহও নহি, ইন্দ্রিয়ও নহি—আমি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। আমিই সেই, আমিই সেই।" *

ইহাই জ্ঞান এবং ইহা ব্যতীত আর যাহা কিছু সবই অজ্ঞান। যাহা কিছু সমুদয়ই অজ্ঞান, অজ্ঞানের ফলস্বরূপ। আমি আবার কি জ্ঞান লাভ করিব? আমি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ। আমি আবার জীবন কি লাভ করিব? আমি স্বয়ং প্রাণস্বরূপ। জীবন আমার স্বরূপের গৌণ বিকাশমাত্র। আমি নিশ্চিত জানি যে, আমি জীবিত, তাহার কারণ, আমিই জীবনস্বরূপ, সেই এক পুরুষ। এমন কোন বস্তুই নাই, যাহা আমার মধ্য দিয়া প্রকাশিত নহে,

* মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং
ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।
ন চ ব্যোমভূমী ন তেজো ন বায়ু-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
—নির্ব্বাণ-ষট্ক।১।

যাহা আমাতে নাই এবং যাহা মৎস্বরূপে অবস্থিত নহে। আমিই ভূতসমূহরূপে প্রকাশিত হইয়াছি। কিন্তু আমি এক, মুক্তস্বরূপ। কে মুক্তি চায়? কেহই মুক্তি চায় না। যদি আপনি আপনাকে বদ্ধ বলিয়া ভাবেন ত বদ্ধই থাকিবেন, আপনি নিজেই নিজের বন্ধনের কারণ হইবেন। আর যদি আপনি উপলব্ধি করেন যে, আপনি মুক্ত, তবে এই মুহূর্ত্তেই আপনি মুক্ত। ইহাই জ্ঞান—মুক্তিপ্রদজ্ঞান এবং সমুদয় প্রকৃতির চরম লক্ষ্যই মুক্তি।

চতুর্থ অধ্যায়।

আত্মার মুক্ত স্বভাব।

আমরা দেখিয়াছি, সাংখ্যের বিশ্লেষণ দ্বৈতবাদে পর্য্যবসিত—উহার সিদ্ধান্ত এই যে, চরম তত্ত্ব—প্রকৃতি ও আত্মা সমূহ। আত্মার সংখ্যা অনন্ত, আর যেহেতু আত্মা অমিশ্র পদার্থ, সেই হেতু উহার বিনাশ নাই, সুতরাং উহা প্রকৃতি হইতে অবশ্যই স্বতন্ত্র। প্রকৃতির পরিণাম হয় এবং তিনি এই সমুদয় প্রপঞ্চ প্রকাশ করেন। সাংখ্যের মতে আত্মা নিষ্ক্রিয়। উহা অমিশ্র আর প্রকৃতি আত্মার অপবর্গ বা মুক্তি সাধনের জন্যই এই সমুদয় প্রপঞ্চজাল বিস্তার করেন আর আত্মা যখন বুঝিতে পারেন, তিনি প্রকৃতি নহেন, তখনই তাঁহার মুক্তি। অপর দিকে ইহাও আমরা দেখিয়াছি যে, সাংখ্যদিগকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, প্রত্যেক আত্মাই সর্ব্বব্যাপী। আত্মা যখন অমিশ্র পদার্থ, তখন তিনি সসীম হইতে পারেন না; কারণ, সমুদয় সীমাবদ্ধ ভাব, দেশ কাল বা নিমিত্ত দ্বারা কৃত হইয়া থাকে। আত্মা যখন সম্পূর্ণরূপে ইহাদের অতীত, তখন তাঁহাতে সসীম ভাব কিছু থাকিতে পারে না। সসীম হইতে গেলে তাঁহাকে দেশের মধ্যে থাকিতে হইবে আর তাহার অর্থ, উঁহার একটা দেহ অবশ্যই থাকিবে, আবার যাঁহার দেহ আছে, তিনি অবশ্য প্রকৃতির অন্তর্গত। যদি

আত্মার আকার থাকিত, তবে ত আত্মা প্রকৃতির সহিত অভিন্ন হইতেন। অতএব আত্মা নিরাকার; আর যাহা নিরাকার, তাহা এখানে, সেখানে বা অন্য কোনখানে আছে, এ কথা বলা যায় না। উহা অবশ্যই সর্ব্বব্যাপী হইবে। সাংখ্য দর্শন ইহার উপরে আর যায় নাই।

সাংখ্যদের এই মতের বিরুদ্ধে বেদান্তীদের প্রথম আপত্তি এই যে, সাংখ্যের এই বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ নহে। যদি প্রকৃতি একটী অমিশ্র বস্তু হয় এবং আত্মাও যদি অমিশ্র বস্তু হয়, তবে দুইটী অমিশ্র বস্তু হইল আর যে সকল যুক্তিতে আত্মার সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রমাণ হয়, তাহা প্রকৃতির পক্ষেও খাটিবে, সুতরাং উহাও সমুদয় দেশ কাল নিমিত্তের অতীত হইবে। প্রকৃতি যদি এইরূপই হয়, তবে উহার কোনরূপ পরিণাম বা বিকাশ হইবে না। ইহাতে গোল হয় এই যে, দুটী অমিশ্র বা পূর্ণ বস্তু স্বীকার করিতে হয়, আর তাহা অসম্ভব। বেদান্তীদের এ সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত? তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, স্থূল জড় হইতে মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব পর্য্যন্ত প্রকৃতির সমুদয় বিকার যখন অচেতন, তখন যাহাতে মন চিন্তা করিতে পারে এবং প্রকৃতি কার্য্য করিতে পারে, তাহার জন্য উহাদের পশ্চাতে উহাদের পরিচালক শক্তি-স্বরূপ একজন চৈতন্যবান্ পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করা আবশ্যক। বেদান্তী বলেন, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাতে এই যে চৈতন্যবান্ পুরুষ রহিয়াছেন, তাঁহাকেই আমরা ঈশ্বর বলি, সুতরাং এই জগৎ তাঁহা হইতে পৃথক্ নহে। তিনি জগতের শুধু নিমিত্ত কারণ নহেন,

উপাদান কারণও বটেন। কারণ কখন কার্য্য হইতে পৃথক্ নহে। কার্য্য কারণেরই রূপান্তর মাত্র। ইহা ত আমরা প্রতিদিনই দেখিতেছি। অতএব ইনিই প্রকৃতির কারণ স্বরূপ। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত বা অদ্বৈত—বেদান্তের যত বিভিন্ন রূপ বা বিভাগ সকলেরই, এই প্রথম সিদ্ধান্ত যে, ঈশ্বর এই জগতের শুধু নিমিত্ত কারণ নহেন, তিনি উহার উপাদান কারণও বটেন, যাহা কিছু জগতে আছে, সবই তিনি। বেদান্তের দ্বিতীয় সোপান এই যে, এই যে আত্মাগণ, ইহারাও ঈশ্বরের অংশস্বরূপ, সেই অনন্ত বহ্নির এক এক স্ফুলিঙ্গমাত্র। অর্থাৎ যেমন এক বৃহৎ অগ্নিরাশি হইতে সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, তদ্রূপই সেই পুরাতন পুরুষ হইতে এই সমুদয় আত্মা বাহির হইয়াছে।*

এ পর্য্যন্ত বেশ হইল, কিন্তু তথাপি এ সিদ্ধান্তেও তৃপ্তি হইতেছে না। অনন্তের অংশ—এ কথার অর্থ কি? অনন্ত যাহা, তাহা ত অবিভাজ্য। অনন্তের কখন অংশ হইতে পারে না। পূর্ণ বস্তু কখন বিভক্ত হইতে পারে না। তবে এই যে বলা হইল, আত্মাসমূহ তাঁহা হইতে স্ফুলিঙ্গের মত বাহির হইয়াছে, এ কথার তাৎপর্য্য কি? অদ্বৈত-বেদান্তী এই সমস্যার এইরূপ মীমাংসা করেন যে, প্রকৃত পক্ষে পূর্ণের অংশ নাই। তিনি বলেন, প্রত্যেক আত্মা প্রকৃত পক্ষে তাঁহার অংশ নহেন, প্রত্যেকে প্রকৃত পক্ষে সেই

* যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে স্বরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি।
—মুণ্ডকোপনিষৎ।২।১।১

অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপ। তবে এত আত্মা কিরূপে আসিল? লক্ষ লক্ষ জলকণার উপর সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়িয়া লক্ষ লক্ষ সূর্য্য দেখাইতেছে আর প্রত্যেক জলকণাতেই ক্ষুদ্রাকারে সূর্য্যের মূর্ত্তি রহিয়াছে। এইরূপ এই সকল আত্মা প্রতিবিম্বস্বরূপ, সত্য নহে। তাহারা প্রকৃত পক্ষে সেই 'আমি' নহে, যিনি এই জগতের ঈশ্বর, ব্রহ্মাণ্ডের এক অবিভক্ত সত্তাস্বরূপ। অতএব এই সকল বিভিন্ন প্রাণী, মানুষ, পশু ইত্যাদি এগুলি প্রতিবিম্বস্বরূপ, সত্য নহে। উহারা প্রকৃতির উপর পতিত মায়াময় প্রতিবিম্বমাত্র। জগতে একমাত্র অনন্ত পুরুষ আছেন আর সেই পুরুষ, 'আপনি', 'আমি' ইত্যাদি রূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, কিন্তু এই ভেদ-প্রতীতি মিথ্যা বই আর কিছুই নহে। তিনি বিভক্ত হন নাই, বিভক্ত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে মাত্র। আর তাঁহাকে দেশকালনিমিত্তের জালের মধ্য দিয়া দেখাতেই এই আপাতপ্রতীয়মান বিভাগ বা ভেদ হইয়াছে। আমি যখন ঈশ্বরকে দেশকালনিমিত্তের জালের মধ্য দিয়া দেখি, তখন আমি তাঁহাকে জড় জগৎ বলিয়া দেখি—যখন আর একটু উচ্চতর ভূমি হইতে অথচ সেই জালের মধ্য দিয়াই তাঁহাকে দেখি, তখন তাঁহাকে পশু বলিয়া—আর একটু উচ্চতর ভূমি হইতে মানবরূপে—আরো উচ্চে যাইলে দেবরূপে দেখিয়া থাকি। কিন্তু তথাপি তিনি জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এক অনন্ত সত্তা এবং আমরাই সেই সত্তাস্বরূপ। আমিও তাহা, আপনিও তাহা—উহার অংশ নহে, সমগ্রটাই। "তিনি অনন্ত জ্ঞাতারূপে সমুদয় প্রপঞ্চের পশ্চাতে দণ্ডায়মান আছেন, আবার তিনি স্বয়ং সমুদয় প্রপঞ্চ-

স্বরূপ।” তিনি বিষয়, বিষয়ী—উভয়ই। তিনিই ‘আমি,’ তিনিই ‘আপনি’। ইহা কিরূপে হইল ?

এই বিষয়টী নিম্নলিখিত ভাবে বুঝান যাইতে পারে। জ্ঞাতাকে কিরূপে জানা যাইবে ?* জ্ঞাতা কখন নিজেকে জানিতে পারে না। আমি সবই দেখিতে পাই, কিন্তু আপনাকে দেখিতে পাই না। সেই আত্মা—যিনি জ্ঞাতা ও সকলের প্রভু, যিনি প্রকৃত বস্তু—তিনিই জগতের সমুদয় দৃষ্টির কারণ, কিন্তু তাঁহার পক্ষে প্রতিবিম্ব ব্যতীত নিজেকে দেখা বা নিজেকে জানা অসম্ভব। আপনি আরসি ব্যতীত আপনার মুখ দেখিতে পান না। তদ্রূপ আত্মাও প্রতিবিম্বিত না হইলে নিজের স্বরূপ দেখিতে পান না। সুতরাং এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই আত্মার নিজেকে উপলব্ধির চেষ্টা-স্বরূপ। প্রাণপঙ্কে (Protoplasm) তাঁহার প্রথম প্রতিবিম্ব, তারপর উদ্ভিদ, পশু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্টতর প্রতিবিম্বগ্রাহক হইতে সর্ব্বোত্তম প্রতিবিম্বগ্রাহক পূর্ণ মানবের প্রকাশ হয়। যেমন কোন মানুষ নিজমুখ দেখিতে ইচ্ছা করিয়া একটী ক্ষুদ্র কর্দ্দমাবিল জলপল্বলে দেখিতে চেষ্টা করিয়া মুখের একটা ওপর-ওপর আকার দেখিতে পাইল। তারপর সে অপেক্ষাকৃত নির্ম্মলতর জলে অপেক্ষাকৃত উত্তম প্রতিবিম্ব দেখিল, তারপর উজ্জ্বল ধাতুতে তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ প্রতিবিম্ব দেখিল। শেষে একখানি আরসি লইয়া তাহাতে দেখিল—তখন সে নিজে ঠিক যেমনটী, ঠিক তেমনি

* বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ।

—বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ।৫।১৫।

আপনাকে প্রতিবিম্বিত দেখিল। অতএব বিষয় ও বিষয়ী উভয়-স্বরূপ সেই পুরুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিবিম্ব—'পূর্ণ মানব'। আপনারা এখন দেখিতে পাইলেন, মানব স্বভাববশতঃই কেন সকল বস্তুর উপাসনা করিয়া থাকে, আর সকল দেশেই পূর্ণ-মানবগণ কেন স্বভাবতঃই ঈশ্বররূপে পূজিত হইয়া থাকেন। আপনারা মুখে যাহাই বলুন না কেন, ইঁহাদের উপাসনা অবশ্যই করিতে হইবে। এই জন্যই লোকে খ্রীষ্ট বা বুদ্ধাদি অবতারগণের উপাসনা করিয়া থাকে। তাঁহারা অনন্ত আত্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশস্বরূপ। আপনি, আমি, ঈশ্বর সম্বন্ধে যে কোন ধারণা করি না কেন, ইঁহারা তাহা হইতেও উচ্চতর। একজন পূর্ণ-মানব এই সকল ধারণা হইতে শ্রেষ্ঠতর। তাঁহাতেই জগৎরূপ বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়—বিষয় ও বিষয়ী এক হইয়া যায়। তাঁহার সকল ভ্রম ও মোহ চলিয়া যায়। তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার এই অনুভূতি হয় যে, তিনি চিরকালই সেই পূর্ণ পুরুষ রহিয়াছেন। তবে এই বন্ধন কিরূপে আসিল? এই পূর্ণ পুরুষের পক্ষে অবনত হইয়া অপূর্ণ-স্বভাব হওয়া কিরূপে সম্ভব হইল? মুক্তের পক্ষে বদ্ধ হওয়া কিরূপে সম্ভব হইল? অদ্বৈতবাদী বলেন, তিনি কোন কালেই বদ্ধ হন নাই, তিনি নিত্য-মুক্ত। আকাশে নানাবর্ণের নানা মেঘ আসিতেছে। উহারা মুহূর্ত্তকাল তথায় থাকিয়া চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু সেই এক নীল আকাশ বরাবর সমান ভাবে রহিয়াছে। আকাশের কখন পরিবর্ত্তন হয় না, মেঘেরই কেবল পরিবর্ত্তন হইতেছে। এইরূপ আপনারাও পূর্ব্ব হইতেই পূর্ণ-স্বভাব, অনন্তকাল ধরিয়া পূর্ণ

রহিয়াছেন। কিছুতেই কখন আপনাদের প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না, কখন করিবেও না। এই যে সব ধারণা, যে—আমি অপূর্ণ, আমি নর, আমি নারী, আমি পাপী, আমি মন, আমি চিন্তা করিয়াছি, আর চিন্তা করিব—এই সমুদয়ই ভ্রমমাত্র। আপনি কখনই চিন্তা করেন না, আপনার কোন কালে দেহ ছিল না, আপনি কোন কালে অপূর্ণ ছিলেন না। আপনি এই ব্রহ্মাণ্ডের আনন্দময় প্রভু। যাহা কিছু আছে বা হইবে, আপনি তৎসমুদয়ের সর্ব্বশক্তিমান্ নিয়ন্তা—এই সূর্য্য চন্দ্র তারা পৃথিবী উদ্ভিদ, এই আমাদের জগতের প্রত্যেক অংশের—মহান্ শাস্তা। আপনার শক্তিতেই সূর্য্য কিরণ দিতেছে, তারাগণ তাহাদের প্রভা বিকীরণ করিতেছে, পৃথিবী সুন্দর হইয়াছে। আপনার আনন্দের শক্তিতেই সকলে পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিতেছে ও পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। আপনিই সকলের মধ্যে রহিয়াছেন, আপনিই সর্ব্বস্বরূপ। কাহাকে ত্যাগ করিবেন, কাহাকেই বা গ্রহণ করিবেন?—আপনিই সমুদয়! যখন এই জ্ঞানের উদয় হয়, তখন মায়ামোহ তৎক্ষণাৎ উড়িয়া যায়।

আমি একবার ভারতের মরুভূমিতে ভ্রমণ করিতেছিলাম। আমি এক মাসের উপর ভ্রমণ করিয়াছিলাম, আর প্রত্যহই আমার সম্মুখে অতিশয় মনোরম দৃশ্যসমূহ—অতি সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ হ্রদাদি—দেখিতে পাইতাম। । একদিন আমি অতিশয় পিপাসার্ত্ত হইয়া একটী হ্রদে জলপান করিব ইচ্ছা করিলাম। কিন্তু যেমন হ্রদের দিকে অগ্রসর হইয়াছি, অমনি উহা অন্তর্হিত হইল। তৎক্ষণাৎ

আমার মস্তিষ্কে যেন প্রবল আঘাতের সহিত এই জ্ঞান আসিল যে, সারা জীবন ধরিয়া আমি যে মরীচিকার কথা পড়িয়া আসিয়াছি, এই সেই মরীচিকা। তখন আমি আমার নিজের এই নির্ব্বুদ্ধিতা স্মরণ করিয়া হাসিতে লাগিলাম যে, গত এক মাস ধরিয়া এই যে সব সুন্দর দৃশ্য ও হ্রদাদি দেখিতে পাইতেছিলাম, তাহারা মরীচিকা ব্যতীত আর কিছুই নহে, অথচ আমি তখন উহা বুঝিতে পারি নাই। পরদিন প্রভাতে আমি আবার চলিতে লাগিলাম— সেই হ্রদ ও সেই সব দৃশ্য আবার দেখা যাইতে লাগিল, কিন্তু ঐ সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ আমার এ জ্ঞানও আসিল যে, উহা মরীচিকা মাত্র। একবার জানিতে পারাতে উহার ভ্রমোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়াছিল। এইরূপই এই জগদ্ভ্রান্তি একদিন ঘুচিবে। এই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড একদিন আমাদের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইবে। ইহার নামই প্রত্যক্ষানুভূতি। দর্শন, কেবল কথার কথা বা তামাসা নহে। ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূত হইবে। এই শরীর উড়িয়া যাইবে, এই পৃথিবী এবং আর যাহা কিছু সবই উড়িয়া যাইবে— আমি দেহ বা আমি মন, এই যে আমাদের জ্ঞান, ইহা কিছুক্ষণের জন্য চলিয়া যাইবে—অথবা যদি কর্ম্ম সম্পূর্ণ ক্ষয় হইয়া থাকে, তবে একেবারে চলিয়া যাইবে, আর ফিরিয়া আসিবে না; আর যদি কর্ম্মের কিয়দংশ অবশিষ্ট থাকে, তবে যেমন কুম্ভকারের চক্র—হাঁড়ি প্রস্তুত হইয়া গেলেও পূর্ব্ব বেগে কিয়ৎক্ষণ ঘুরিতে থাকে, তদ্রূপ মায়ামোহ সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া গেলেও এই দেহ কিছুদিন থাকিয়া যাইবে। এই জগৎ—নরনারী প্রাণী—সকল

আবার আসিবে—যেমন পরদিনেও মরীচিকা দেখা গিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় উহারা শক্তি বিস্তার করিতে পারিবে না, কারণ, সঙ্গে সঙ্গে এই জ্ঞানও আসিবে যে,আমি উহাদের স্বরূপ জানিয়াছি। তখন উহারা আর বদ্ধ করিতে পারিবে না, কোনরূপ দুঃখ কষ্ট শোক আর আসিতে পারিবে না। যখন দুঃখকর বিষয় কিছু আসিবে, মন তাহাকে বলিতে পারিবে যে, আমি জানি তুমি ভ্রম মাত্র। যখন মানব এই অবস্থা লাভ করে, তাহাকে জীবন্মুক্ত বলে। জীবন্মুক্ত অর্থে জীবিত অবস্থায়ই যে মুক্ত। জ্ঞান-যোগীর জীবনের উদ্দেশ্য এই জীবন্মুক্ত হওয়া। তিনিই জীবন্মুক্ত, যিনি এই জগতে অনাসক্ত হইয়া বাস করিতে পারেন। তিনি জলস্থ পদ্মপত্রের ন্যায় থাকেন—উহা যেমন জলের মধ্যে থাকিলেও জল উহাকে কখনই ভিজাইতে পারে না, তদ্রূপ তিনি জগতে নির্লিপ্ত ভাবে থাকেন। তিনি মনুষ্যজাতির মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ, শুধু তাহাই কেন, সকল প্রাণীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, তিনি সেই পূর্ণস্বরূপের সহিত অভেদ ভাব উপলব্ধি করিয়াছেন; তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন যে, তিনি ভগবানের সহিত অভিন্ন। যতদিন আপনার জ্ঞান থাকে যে, ভগবানের সহিত আপনার অতি সামান্য ভেদও আছে, ততদিন আপনার ভয় থাকিবে। কিন্তু যখন আপনি জানিবেন যে, আপনিই তিনি, তাঁহাতে আপনাতে কোন ভেদ নাই, বিন্দুমাত্র ভেদ নাই, তাঁহার সমগ্রটাই আপনি, তখন—সকল ভয় দূর হইয়া যায়। "সেখানে কে কাহাকে দেখে? কে কাহার উপাসনা করে? কে কাহার সহিত কথা

বলে ? কে কাহার কথা শুনে ? যেখানে একজন অপরকে দেখে, একজন অপরকে কথা বলে, একজন অপরের কথা শুনে, উহা নিয়মের রাজ্য। যেখানে কেহ কাহাকে দেখে না, কেহ কাহাকে কথা বলে না, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাই ভূমা, তাহাই ব্রহ্ম।”* আপনিই তাহা এবং সর্ব্বদাই তাহা আছেন। তখন জগতের কি হইবে ? আমরা জগতের কি উপকার করিতে পারিব—এরূপ প্রশ্নই সেখানে উদয় হয় না। এ সেই শিশুর কথার মত—আমি বড় হইলে আমার মিঠাইয়ের কি হবে ? বালকও বলিয়া থাকে, আমি বড় হইলে আমার মার্ব্বেলগুলির কি দশা হবে, তবে আমি বড় হব না। ছোট ছেলেও বলে, আমি বড় হইলে আমার পুতুল-গুলির কি দশা হইবে ?—এই জগৎ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নগুলিও তদ্রূপ। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই তিন কালেই জগতের অস্তিত্ব নাই। যদি আমরা আত্মার যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারি, যদি আমরা জানিতে পারি যে, এই আত্মা ব্যতীত আর কিছুই নাই, আর যাহা কিছু সব স্বপ্নমাত্র, উহাদের প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ব নাই, তবে এই জগতের দুঃখ দারিদ্র্য, পাপ পুণ্য—কিছুতেই আমাদিগকে চঞ্চল করিতে পারিবে না। যদি উহাদের অস্তিত্বই না থাকে, তবে কাহার জন্য এবং কিসের জন্য আমি কষ্ট করিব ? জ্ঞান-যোগীরা ইহাই শিক্ষা দেন। অতএব সাহস অবলম্বন করিয়া মুক্ত হউন, আপনাদের চিন্তাশক্তি আপনাদিগকে যতদূর পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারে সাহসপূর্ব্বক ততদূর অগ্রসর হউন এবং সাহস-

* ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক দেখ।

পূর্ব্বক উহা জীবনে পরিণত করুন। এই জ্ঞান লাভ করা বড় কঠিন। ইহা মহা সাহসীর কার্য্য। যে সমুদয় পুতুল ভাঙ্গিয়া ফেলিতে সাহস করে—শুধু মানসিক বা কুসংস্কাররূপ পুতুল নহে, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহরূপ পুতুলগুলিকেও যে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে—ইহা তাঁহারই কার্য্য।

এই শরীর আমি নহি, ইহার নাশ অবশ্যম্ভাবী—এই ত হইল উপদেশ। কিন্তু এই উপদেশের দোহাই দিয়া লোকে অনেক কিম্ভূত ব্যাপার করিয়া থাকে। একজন লোক উঠিয়া বলিল, "আমি দেহ নহি, অতএব আমার মাথাধরা আরাম হইয়া যাক্।" কিন্তু তাহার শিরঃপীড়া যদি তাহার দেহে না থাকে, তবে আর কোথায় আছে? সহস্র সহস্র শিরঃপীড়া ও সহস্র সহস্র দেহ আসুক যাক্—তাহাতে আমার কি?

"আমার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই; আমার পিতাও নাই, মাতাও নাই; আমার শত্রুও নাই, মিত্রও নাই; কারণ, তাহারা সকলেই আমি। আমিই আমার বন্ধু, আমিই আমার শত্রু, আমিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, আমিই সেই, আমিই সেই।"*

* ন মে মৃত্যুশঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যঃ
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং ॥
—নির্ব্বাণষট্‌ক ।৫।

যদি আমি সহস্র দেহে জ্বর ও অন্যান্য রোগ ভোগ করিতে থাকি, আবার লক্ষ লক্ষ দেহে আমি স্বাস্থ্য সম্ভোগ করিতেছি। যদি সহস্র সহস্র দেহে আমি উপবাস করি, আবার অন্য সহস্র দেহে প্রচুর পরিমাণে আহার করিতেছি। যদি সহস্র দেহে আমি দুঃখভোগ করিতে থাকি, আবার সহস্র দেহে আমি সুখভোগ করিতেছি। কে কাহার নিন্দা করিবে? কে কাহার স্তুতি করিবে? কাহাকে চাহিবে, কাহাকে ছাড়িবে? আমি কাহাকেও চাইও না, কাহাকেও ত্যাগও করি না; কারণ, আমি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ। আমিই আপন স্তুতি করিতেছি, আমিই আমার নিন্দা করিতেছি, আমি নিজের দোষে নিজে কষ্ট পাইতেছি আর আমি যে সুখী, তাহাও আমার নিজের ইচ্ছায়। আমি স্বাধীন। এই জ্ঞানীর ভাব—তিনি মহা সাহসী—অকুতোভয়, নির্ভীক। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট হইয়া যাক না কেন, তিনি হাস্য করিয়া বলেন, উহার কখনও অস্তিত্বই ছিল না, উহা কেবল মায়া ও ভ্রম মাত্র। এইরূপে তিনি তাঁহার চক্ষের সমক্ষে জগদ্ব্রহ্মাণ্ডকে যথার্থই অন্তর্হিত হইতে দেখেন আর বিস্ময়ের প্রতি প্রশ্ন করেন—

এ জগৎ কোথায় ছিল? কোথায়ই বা মিলাইয়া গেল?*

এই জ্ঞানের সাধনসম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আর একটী আশঙ্কার আলোচনা ও তৎসমাধানে চেষ্টা করিব। এ পর্য্যন্ত যাহা বিচার করা হইল, তাহা ন্যায় শাস্ত্রের

---

* ক্ব গতং কেন বা নীতং কুত্র লীনমিদং জগৎ।

—বিবেকচূড়ামণি ।৪৮৫

সীমা বিন্দুমাত্র উল্লঙ্ঘন করে নাই। যদি কোনও ব্যক্তি বিচারে প্রবৃত্ত হয়, তবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সে সিদ্ধান্ত করে, যে একমাত্র সত্তাই বর্ত্তমান আর সমুদয়ই কিছুই নহে, ততক্ষণ তাহার থামিবার যো নাই। যুক্তিপরায়ণ মানবজাতির পক্ষে এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন ব্যতীত গত্যন্তর নাই। কিন্তু এক্ষণে প্রশ্ন এই, যিনি অসীম, সদা পূর্ণ, সদানন্দময়, অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তিনি এই সব ভ্রমের অধীন হইলেন কিরূপে? এই প্রশ্নই জগতের সর্ব্বত্র সকল সময়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া আসিতেছে। সাধারণ চলিত কথায় প্রশ্নটী এই-রূপে করা হয়—এই জগতে পাপ কিরূপে আসিল। প্রশ্নটীর ইহাই চলিত ও ব্যবহারিক রূপ আর অপরটী অপেক্ষাকৃত দার্শনিক রূপ। কিন্তু উত্তর একই। নানারূপে নানাভাবে নানাধরণে ঐ একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, কিন্তু নিম্নতররূপে প্রশ্ন কৃত হইলে উহার ঠিক মীমাংসা হয় না; কারণ, আপেল, সাপ ও নারীর গল্পে * এই তত্ত্বের কিছুই ব্যাখ্যা হয় না। ঐ অবস্থায় প্রশ্নটীও যেমন শিশুজনোচিত, উহার উত্তরও তদ্রূপ। কিন্তু বেদান্তে এই প্রশ্নটী অতি গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে—এই ভ্রম কিরূপে

---

* বাইবেলের ওল্ড টেষ্টামেণ্টে আছে, ঈশ্বর আদি নর আদম ও আদি নারী হবাকে সৃজন করিয়া তাহাদিগকে নন্দনকানন নামক সুরম্য উদ্যানে স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে ঐ উদ্যানস্থ জ্ঞান-বৃক্ষের ফলভোজনে নিষেধ করেন। কিন্তু শয়তান সর্পরূপধারী হইয়া প্রথমে হবাকে প্রলোভিত করিয়া তৎপরে তাহার দ্বারা আদমকে ঐ বৃক্ষের ফলভোজনে প্রলোভিত করে। উহাতেই তাহাদের ভালমন্দ জ্ঞান উপস্থিত হইয়া পাপ প্রথম পৃথিবীতে প্রবেশ করিল।

আসিল ?—আর উত্তরও তদ্রূপ গভীর। উত্তরটী এই যে, অসম্ভব প্রশ্নের উত্তরের আশা করিও না। ঐ প্রশ্নটীর অন্তর্গত বাক্যগুলি পরস্পর বিরোধী বলিয়া প্রশ্নটীই অসম্ভব। কেন ? পূর্ণতা বলিতে কি বুঝায় ? যাহা দেশকালনিমিত্তের অতীত, তাহাই পূর্ণ। তার পর আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, পূর্ণ কিরূপে অপূর্ণ হইল ? ন্যায়শাস্ত্রসঙ্গত ভাষায় নিবদ্ধ করিলে প্রশ্নটি এই আকারে দাঁড়ায়—"যে বস্তু কার্য্যকারণসম্বন্ধের অতীত, তাহা কিরূপে কার্য্যরূপে পরিণত হয় ?" এখানে ত আপনিই আপনাকে খণ্ডন করিতেছেন। আপনি প্রথমেই মানিয়া লইয়াছেন, উহা কার্য্যকারণসম্বন্ধের অতীত, তার পর আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিরূপে উহা কার্য্যে পরিণত হয়। কার্য্যকারণ সম্বন্ধের সীমার ভিতরেই কেবল প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে পারে। যতদূর পর্য্যন্ত দেশকাল নিমিত্তের অধিকার, ততদূর পর্য্যন্ত এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার পরের বস্তু সম্বন্ধে প্রশ্ন করাই নিরর্থক ; কারণ, প্রশ্নটী ন্যায়শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। দেশকালনিমিত্তের গণ্ডীর ভিতরে কোন কালে উহার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে না, আর উহাদের অতীত প্রদেশে গেলে কি উত্তর পাওয়া যাইবে, তাহা তথায় গেলেই জানা যাইতে পারে। এই হেতু বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই প্রশ্নটীর উত্তরের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হন না। যখন লোকে পীড়িত হয়, তখন 'কিরূপে ঐ রোগের উৎপত্তি হইল, তাহা প্রথমে জানিতে হইবে' এই বিষয়ে বিশেষ জেদ না করিয়া রোগ যাহাতে সারিয়া যায়, তাহারই জন্য প্রাণপণ যত্ন করে।

এই প্রশ্ন আর এক আকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষাকৃত নিম্নদৃষ্টির কথা বটে, কিন্তু ইহাতে আমাদের কর্ম্ম-জীবনের সঙ্গে অনেকটা সম্বন্ধ আছে এবং ইহাতে তত্ত্বটী অনেকটা স্পষ্টতর হইয়া আসে। প্রশ্নটী এই—এই ভ্রম কে প্রসব করিল? কোন সত্য কি কখন ভ্রম প্রসব করিতে পারে? কখনই নহে। আমরা দেখিতে পাই, একটা ভ্রমই আর একটা ভ্রম প্রসব করিয়া থাকে, সেটি আবার একটি ভ্রম প্রসব করে, এইরূপ চলিতে থাকে। ভ্রমই চিরকাল ভ্রম প্রসব করিয়া থাকে। রোগই রোগ প্রসব করিয়া থাকে, স্বাস্থ্য কখন রোগ প্রসব করে না। জল ও জলের তরঙ্গে কোন ভেদ নাই—কার্য্য, কারণেরই আর একরূপমাত্র। কার্য্য যখন ভ্রম, তখন তাহার কারণও অবশ্য ভ্রম হইবে। এই ভ্রম কে প্রসব করিল? অবশ্য আর একটী ভ্রম। এইরূপে তর্ক করিলে তর্কের আর শেষ হইবে না—ভ্রমের আর আদি পাওয়া যাইবে না। এখন আপনাদের একটী প্রশ্ন মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে যে, "ভ্রমের অনাদিত্ব স্বীকার করিলে কি আপনার অদ্বৈতবাদ খণ্ডিত হইল না? কারণ, আপনি জগতে দুটী সত্তা স্বীকার করিতেছেন—একটী আপনি, আর একটী ঐ ভ্রম।" ইহার উত্তর এই যে, ভ্রমকে সত্তা বলা যাইতে পারে না। আপনারা জীবনে সহস্র সহস্র স্বপ্ন দেখিতেছেন, কিন্তু সেগুলি আপনাদের জীবনের অংশস্বরূপ নহে। স্বপ্ন আসে আবার চলিয়া যায়। উহাদের কোন অস্তিত্ব নাই। ভ্রমকে একটা সত্তা বা অস্তিত্ব বলিলে উহা আপাততঃ যুক্তিসঙ্গতঃ মনে হয় বটে, বাস্ত-

বিক কিন্তু উহা অযৌক্তিক কথা মাত্র। অতএব জগতে নিত্যমুক্ত ও নিত্যানন্দস্বরূপ একমাত্র সত্তা আছে, আর তাহাই আপনি। অদ্বৈতবাদীদের ইহাই চরম সিদ্ধান্ত। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, এই যে সকল বিভিন্ন উপাসনাপ্রণালী রহিয়াছে, এ গুলির কি হইবে ? তাহারা সব থাকিবে। উহারা কেবল অন্ধকারে আলোর জন্য হাতড়ান মাত্র, আর ঐরূপ হাতড়াইতে হাতড়াইতে আলোক আসিবে। আমরা এইমাত্র দেখিয়া আসিয়াছি যে, আত্মা আপনাকে দেখিতে পায় না। আমাদের সমুদয় জ্ঞান মায়ার (মিথ্যার) জালের মধ্যে অবস্থিত, মুক্তি উহাদের বাহিরে। এই জালের মধ্যে দাসত্ব, ইহার সমুদয়ই নিয়মাধীন। উহার বাহিরে আর কোন নিয়ম নাই। এই ব্রহ্মাণ্ড যতদূর পর্য্যন্ত, ততদূর পর্য্যন্ত সত্তা নিয়মাধীন, মুক্তি তাহার বাহিরে। যতদিন আপনি দেশকালনিমিত্তের জালের মধ্যে রহিয়াছেন, ততদিন পর্য্যন্ত আপনি মুক্ত—এ কথা বলা নিরর্থক। কারণ, ঐ জালের মধ্যে সমুদয়ই কঠোর নিয়মে, কার্য্যকারণশৃঙ্খলে বদ্ধ। আপনি যে কোন চিন্তা করেন, তাহা পূর্ব্ব কারণের কার্য্যস্বরূপ, প্রত্যেক ভাবই কারণের কার্য্যস্বরূপ। ইচ্ছাকে স্বাধীন বলা সম্পূর্ণ নিরর্থক। যখনই সেই অনন্ত সত্তা যেন এই মায়াজালের মধ্যে পড়ে, তখনই উহা ইচ্ছার আকার ধারণ করে। ইচ্ছা মায়াজালে আবদ্ধ সেই পুরুষের কিঞ্চিদংশমাত্র, সুতরাং "স্বাধীন ইচ্ছা" বাক্যটীর কোন অর্থ নাই, উহা সম্পূর্ণ নিরর্থক। স্বাধীনতা বা মুক্তি সম্বন্ধে এই সমুদয় বাগাড়ম্বরও বৃথা। মায়ার ভিতর স্বাধীনতা নাই।

প্রত্যেক ব্যক্তিই চিন্তায়, মনে, কার্য্যে একখণ্ড প্রস্তর বা এই টেবিলটার মত বদ্ধ। আমি আপনাদের নিকট বক্তৃতা দিতেছি, আর আপনারা আমার কথা শুনিতেছেন, এই উভয়ই কঠোর কার্য্যকারণ নিয়মের অধীন। মায়া হইতে যত দিন না বাহিরে যাইতেছেন, ততদিন স্বাধীনতা বা মুক্তি নাই। ঐ মায়াতীত অবস্থাই আত্মার যথার্থ স্বাধীনতা। কিন্তু মানুষ যতদূর তীক্ষ্ণবুদ্ধি হউক না কেন, এখনকার কোন বস্তুই স্বাধীন বা মুক্ত হইতে পারে না—এই যুক্তির বল যতদূর স্পষ্টরূপে দেখুক না কেন, সকলকেই বাধ্য হইয়া আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া চিন্তা করিতে হয়, তাহা না করিয়া থাকিতেই পারে না। যতক্ষণ না আমরা বলি যে আমরা স্বাধীন, ততক্ষণ কোন কাযই চলিতে পারে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমরা যে স্বাধীনতার কথা বলিয়া থাকি, তাহা অজ্ঞানরূপ মেঘরাশির মধ্য দিয়া নির্ম্মল নীলাকাশরূপ সেই শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মার চকিতদর্শনমাত্র, আর নীলাকাশরূপ প্রকৃত স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তস্বভাব আত্মা উহার বাহিরে রহিয়াছেন। যথার্থ স্বাধীনতা এই ভ্রমের মধ্যে, এই মিথ্যার মধ্যে, এই বাজে দুনিয়ার মধ্যে, ইন্দ্রিয়-মন-দেহ-সমন্বিত এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে থাকিতে পারে না। এই সমুদয় অনাদি অনন্ত স্বপ্ন—যাহা আমাদের বশে নাই, যাহাদিগকে বশে আনাও যায় না, যাহারা অযথা-সন্নিবেশিত, ভগ্ন ও অসামঞ্জস্যময়—সেই সমুদয় স্বপ্নগুলিকে লইয়া আমাদের এই জগৎ। আপনি যখন স্বপ্নে দেখেন যে, বিশ-মুণ্ড একটা দৈত্য আপনাকে ধরিবার জন্য আসি-

তেছে, আর আপনি তাহার নিকট হইতে পলাইতেছেন, আপনি উহাকে অসংলগ্ন জ্ঞান করেন না। আপনি মনে করেন, এ ত ঠিকই হইতেছে। আমরা যাহাকে নিয়ম বলি, তাহাও এইরূপ। যাহা কিছু আপনি নিয়ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন, তাহা কেবলমাত্র আকস্মিক ঘটনামাত্র, উহাদের কোন অর্থ নাই। এই স্বপ্নাবস্থায় আপনি উহাকে নিয়ম বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। মায়ার ভিতর, যতদূর পর্য্যন্ত এই দেশকালনিমিত্তের নিয়ম বিদ্যমান, ততদূর পর্য্যন্ত স্বাধীনতা বা মুক্তি নাই আর এই বিভিন্ন উপাসনা-প্রণালীসমূহ সমুদয়ই এই মায়ার অন্তর্গত। ঈশ্বর-ধারণা এবং পশু ও মানবের ধারণা সমুদয়ই এই মায়ার মধ্যে, সুতরাং সবগুলিই সমভাবে ভ্রমাত্মক, সবগুলিই স্বপ্নমাত্র। তবে আজকাল আমরা কতকগুলি অতিবুদ্ধি দিগ্‌গজ দেখিতে পাই। আপনারা তাঁহাদের মত যেন তর্ক বা সিদ্ধান্ত না করিয়া বসেন, সেই বিষয়ে সাবধান হইবেন। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বরধারণা ভ্রমাত্মক, কিন্তু এই জগতের ধারণা সত্য। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এই উভয় ধারণাই একই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহারই কেবল যথার্থ নাস্তিক হইবার অধিকার আছে, যিনি ইহ জগৎ পরজগৎ উভয়ই অস্বীকার করেন। উভয়টীই একই যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বর হইতে ক্ষুদ্রতম জীব পর্য্যন্ত, আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সেই এক মায়ার রাজত্ব। একই প্রকার যুক্তিতে ইহাদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা বা নাস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি ঈশ্বর ধারণা ভ্রমাত্মক জ্ঞান করেন, তাঁহার নিজ দেহ ও মনের ধারণাও ভ্রমাত্মক জ্ঞান করা উচিত। যখন ঈশ্বর উড়িয়া

যান, তখন দেহ ও মন উড়িয়া যায় আর যখন উভয়েরই লোপ হয়, তখনই যাহা যথার্থ সত্তা, তাহা চিরকালের জন্য থাকিয়া যায়।

"তথায় চক্ষু যাইতে পারে না, বাক্যও যাইতে পারে না, মনও নহে। আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না বা জানিতেও পারি না।" *

ইহার তাৎপর্য্য আমরা এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, যতদূর পর্য্যন্ত বাক্য, চিন্তা বা বুদ্ধি যাইতে পারে, ততদূর পর্য্যন্ত মায়ার অধিকার, ততদূর পর্য্যন্ত বন্ধনের ভিতর। সত্য উহাদের বাহিরে। তথায় চিন্তা মন বা বাক্য কিছুই পঁহুছিতে পারে না।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত বিচারের দ্বারা ত বেশ বুঝা গেল, কিন্তু এই-বার সাধনের কথা আসিতেছে। এই সব ক্লাসে আসল শিক্ষার বিষয় সাধন। এই একত্ব উপলব্ধির জন্য কোন প্রকার সাধনের প্রয়োজন আছে কি? নিশ্চিত আছে। সাধনের দ্বারা যে আপনা-দিগকে এই ব্রহ্ম হইতে হইবে, তাহা নহে, আপনারা ত পূর্ব্ব হই-তেই তাহা আছেন। আপনাদিগকে ঈশ্বর হইতে হইবে বা পূর্ণ হইতে হইবে, এ কথা সত্য নহে। আপনারা সদাই পূর্ণস্বরূপ রহিয়াছেন আর যখনই আপনারা মনে করেন, আপনারা পূর্ণ নহেন, সে ত একটা ভ্রম। এই ভ্রম—যাহাতে আপনাদিগকে অমুক পুরুষ, অমুক নারী বলিয়া বোধ হইতেছে, আর একটী ভ্রমের দ্বারা দূর হইতে পারে আর সাধনা বা অভ্যাসই সেই অপর ভ্রম

* ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ। ইত্যাদি
—কেন উপনিষৎ।১।৩

আগুন আগুনকে খাইয়া ফেলিবে—আপনারা এক ভ্রমকে নাশ করিবার জন্য অপর ভ্রমের সাহায্য লইতে পারেন। একখণ্ড মেঘ আসিয়া অপর খণ্ড মেঘকে সরাইয়া দিবে, শেষে উভয়টাই চলিয়া যাইবে। তবে এই সাধনাগুলি কি ? আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা যে মুক্ত হইব তাহা নহে ; আমরা সদাই মুক্ত। আমরা বদ্ধ, এরূপ ভাবনামাত্রই ভ্রম ; আমরা সুখী বা আমরা অসুখী, এরূপ ভাবনামাত্রই গুরুতর ভ্রম। আর এক ভ্রম আসিবে যে, আমাদিগকে মুক্ত হইবার জন্য সাধনা, উপাসনা ও চেষ্টা করিতে হইবে ; এই ভ্রম আসিয়া প্রথম ভ্রমটাকে তাড়াইয়া দিবে ; তখন উভয় ভ্রমই দূর হইয়া যাইবে।

মুসলমানেরা শিয়ালকে অতিশয় অপবিত্র মনে করিয়া থাকে, হিন্দুরাও তদ্রূপ কুকুরকে অশুচি ভাবিয়া থাকে। অতএব শৃগাল বা কুকুর খাবার ছুঁইলে উহা ফেলিয়া দিতে হয়, উহা আর কাহারও খাইবার যো নাই। কোন মুসলমানের বাটীতে একটী শৃগাল প্রবেশ করিয়া টেবিল হইতে কিছু খাদ্য লইয়া খাইয়া পলাইল। লোকটী বড়ই দরিদ্র ছিল। সে নিজের জন্য সে দিন অতি উত্তম ভোজের আয়োজন করিয়াছিল আর সেই ভোজ্য দ্রব্য সমুদয় শিয়ালের স্পর্শে অপবিত্র হইয়া গেল ! আর তাহার খাইবার যো নাই ! কাজে কাজেই সে একজন মোল্লার কাছে গিয়া নিবেদন করিল— "সাহেব, গরিবের এক নিবেদন শুনুন। একটা শিয়াল আসিয়া আমার খাদ্য হইতে খানিকটা লইয়া খাইয়া গিয়াছে, এখন ইহার একটা উপায় করুন। আমি অতি সুখাদ্য সব প্রস্তুত করিয়া-

ছিলাম। আমার বড়ই বাসনা ছিল যে, পরম তৃপ্তির সহিত উহা ভোজন করিব। এখন শিয়াল ব্যাটা আসিয়া সব নষ্ট করিয়া দিয়া গেল। আপনি ইহার যাহা হয় একটা ব্যবস্থা দিন।” মোল্লা মুহূর্ত্তেকের জন্য একটু ভাবিলেন, তার পর উহার একমাত্র সিদ্ধান্ত করিয়া বলিলেন, “ইহার একমাত্র উপায়—একটা কুকুর লইয়া আসিয়া যে থালা হইতে শিয়ালটা খাইয়া গিয়াছে, সেই থালা হইতে তাহাকে একটু খাওয়ানো। এখন কুকুর শিয়ালের নিত্য বিবাদ। তা শিয়ালের উচ্ছিষ্টটাও তোমার পেটে যাইবে, কুকুরের উচ্ছিষ্টটাও যাইবে, ঐ দুই উচ্ছিষ্টে পরস্পর সেখানে ঝগড়া লাগিবে, তখন সব শুদ্ধ হইয়া যাইবে।” আমরাও অনেকটা এইরূপ সমস্যায় পড়িয়াছি। আমরা যে অপূর্ণ, ইহা একটী ভ্রম; আমরা উহা দূর করিবার জন্য আর একটী ভ্রমের সাহায্য লইলাম যে, পূর্ণতালাভের জন্য আমাদিগকে সাধনা করিতে হইবে। তখন একটী ভ্রম আর একটী ভ্রমকে দূর করিয়া দিবে, যেমন আমরা একটা কাঁটা তুলিবার জন্য আর একটা কাঁটার সাহায্য লইতে পারি এবং শেষে উভয় কাঁটাই ফেলিয়া দিতে পারি। এমন লোক আছেন, যাঁহাদের পক্ষে একবার তত্ত্বমসি শুনিলেই তৎক্ষণাৎ জ্ঞানের উদয় হয়। চকিতের মধ্যে এই জগৎ উড়িয়া যায় আর আত্মার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ পাইতে থাকে, কিন্তু আর সকলকে এই বন্ধনের ধারণা দূর করিবার জন্য কঠোর চেষ্টা করিতে হয়।

প্রথম প্রশ্ন এই, জ্ঞানযোগী হইবার অধিকারী কাহারা?

যাঁহাদের নিম্নলিখিত সাধনসম্পত্তিগুলি আছে। প্রথমতঃ, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, এই জীবনে বা পরজীবনে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মফল ও সর্ব্বপ্রকার ভোগ বাসনার ত্যাগ। যদি আপনিই এই জগতের স্রষ্টা হন, তবে আপনি যাহা বাসনা করিবেন, তাহাই পাইবেন; কারণ, আপনি উহা স্বীয় ভোগের জন্য সৃষ্টি করিবেন। কেবল কাহারো শীঘ্র, কাহারো বা বিলম্বে ঐ ফললাভ হইয়া থাকে। কেহ কেহ তৎক্ষণাৎ উহা প্রাপ্ত হয়, অপরের পক্ষে তাহাদের ভূতসংস্কার-সমষ্টি তাহাদের বাসনাপূর্ত্তির ব্যাঘাত করিতে থাকে। আমরা ইহজন্ম বা পরজন্মের ভোগবাসনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়া থাকি। ইহজন্ম বা পরজন্ম বা আপনার কোনরূপ জন্ম আছে, ইহা একেবারে অস্বীকার করুন; কারণ, জীবন মৃত্যুরই নামান্তর মাত্র। আপনি যে জীবনসম্পন্ন প্রাণী, ইহাও অস্বীকার করুন। জীবনের জন্য কে ব্যস্ত? জীবন একটা ভ্রমমাত্র, মৃত্যু উহার আর এক দিক্ মাত্র। সুখ এই ভ্রমের এক দিক্, দুঃখ আর এক দিক্। সকল বিষয়েই এইরূপ। আপনার জীবন বা মৃত্যু লইয়া কি হইবে? এ সকলই ত মনের সৃষ্টি মাত্র। ইহাকেই ইহামুত্রফলভোগবিরাগ বলে।

তারপর শম বা মনঃসংযমের প্রয়োজন। মনকে এমন শান্ত করিতে হইবে যে, উহা আর তরঙ্গাকারে ভগ্ন হইয়া সর্ব্ববিধ বাসনার লীলাক্ষেত্র হইবে না। মনকে স্থির রাখিতে হইবে, বাহিরের বা ভিতরের কোন কারণ হইতে উহাতে যেন তরঙ্গ না উঠে—কেবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মনকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করিতে হইবে। জ্ঞানযোগী শারীরিক বা মানসিক কোনরূপ সহায় লন

না। তিনি কেবল দার্শনিক বিচার, জ্ঞান ও নিজ ইচ্ছাশক্তি—এই সকল সাধনেই বিশ্বাসী। তার পর তিতিক্ষা—কোনরূপ বিলাপ না করিয়া সর্ব্ববিদুঃখ সহন। যখন আপনার কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিবে, সেদিকে খেয়াল করিবেন না। যদি সম্মুখে একটী ব্যাঘ্র আসে, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকুন। পলাইবে কে? অনেক লোক আছেন, যাঁহারা তিতিক্ষা অভ্যাস করেন এবং তাহাতে কৃতকার্য্যও হন। এমন লোক অনেক আছেন, যাঁহারা ভারতে গ্রীষ্মকালে প্রখর মধ্যাহ্ন সূর্য্যের তাপে গঙ্গাতীরে শুইয়া থাকেন আবার শীতকালে গঙ্গাজলে সারাদিন ধরিয়া ভাসেন। তাঁহারা এ সকল গ্রাহ্যই করেন না। অনেক লোকে হিমালয়ের তুষাররাশির মধ্যে বসিয়া থাকে, কোন প্রকার বস্ত্রাদির জন্য খেয়ালও করে না। গ্রীষ্মই বা কি? শীতই বা কি? এ সকল আসুক যাক—আমার তাহাতে কি? আমি ত শরীর নহি। এই পাশ্চাত্য দেশসমূহে ইহা বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু এইরূপ যে লোকে করিয়া থাকে, তাহা জানিয়া রাখা ভাল। যেমন আপনাদের দেশের লোকে কামানের মুখে বা যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে লাফাইয়া পড়িতে সাহসিকতা দেখাইয়া থাকেন, আমাদের দেশের লোকও তদ্রূপ তাঁহাদের দর্শনানুসারে চিন্তাপ্রণালী নিয়মিত করিতে ও তদনুসারে কার্য্য করিতে সাহসিকতা দেখাইয়া থাকেন। তাঁহারা ইহার জন্য প্রাণ দিয়া থাকেন। "আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ—'সোঽহং, সোঽহং'।" দৈনন্দিন কর্ম্মজীবনে বিলাসিতাকে বজায় রাখা যেমন পাশ্চাত্য আদর্শ, তেমনি আমাদের আদর্শ কর্ম্ম-

জীবনে সর্ব্বোচ্চদরের আধ্যাত্মিক ভাব রক্ষা করা। আমরা উহার দ্বারা ইহাই প্রমাণ করিতে চাই যে, ধর্ম্ম কেবল ভূয়ো কথামাত্র নহে, কিন্তু এই জীবনেই ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে। ইহাই তিতিক্ষা—সমুদয় সহ্য করা— কোন বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ না করা। আমি নিজে এমন লোক দেখিয়াছি, যাঁহারা বলেন, "আমি আত্মা—আমার নিকট ব্রহ্মাণ্ডের আবার গৌরব কি? সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, শীত উষ্ণ, এ সকল আমার পক্ষে কিছুই নহে।" ইহাই তিতিক্ষা—দেহের ভোগসুখের জন্য ধাবমান হওয়া নহে। ধর্ম্ম কি? ধর্ম্ম মানে কি এইরূপ প্রার্থনা করিতে হইবে যে, "আমাকে এই দাও, ওই দাও?" ধর্ম্ম সম্বন্ধে এ সকল আহাম্মকি ধারণা। যাহারা ধর্ম্মকে ঐরূপ মনে করে, তাহাদের ঈশ্বর ও আত্মার যথার্থ ধারণা নাই। মদীয় আচার্য্যদেব বলিতেন, "চিল শকুনি খুব উঁচুতে উড়ে, কিন্তু তার নজর থাকে গোভাগাড়ে।" যাহা হউক আপনাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যে সকল ধারণা আছে, তাহার ফলটা কি বলুন দেখি। রাস্তা সাফ করা আর উত্তমরূপ অন্নবস্ত্রের যোগাড় করা? অন্নবস্ত্রের জন্য কে ভাবে? প্রতি মুহূর্ত্তে লক্ষ লোক আসিতেছে, লক্ষ লোক যাইতেছে—কে গ্রাহ্য করে? এই ক্ষুদ্র জগতের সুখ দুঃখ গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন কেন? যদি সাহস থাকে, উহাদের বাহিরে চলিয়া যান। সমুদয় নিয়মের বাহিরে চলিয়া যান, সমগ্র জগৎ উড়িয়া যাক্—আপনি একলা আসিয়া দাঁড়ান। "আমি নিরপেক্ষ সত্তা, নিরপেক্ষ জ্ঞান ও নিরপেক্ষ আনন্দস্বরূপ—সোঽহং, সোঽহং।"

পঞ্চম অধ্যায়।

বহুরূপে প্রকাশিত এক সত্তা।

আমরা দেখিয়াছি, বৈরাগ্য বা ত্যাগই এই সমুদয় বিভিন্ন যোগের মূল ভিত্তি। কর্ম্মী কর্ম্মফল ত্যাগ করেন। ভক্ত সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বব্যাপী প্রেমস্বরূপের জন্য সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রেম ত্যাগ করেন। যোগী যাহা কিছু অনুভব করেন, তাঁহার যাহা কিছু অভিজ্ঞতা সমুদয় পরিত্যাগ করেন, কারণ. তাঁহার যোগশাস্ত্রের শিক্ষা এই যে, সমুদয় প্রকৃতি, যদিও আত্মার ভোগ ও অভিজ্ঞতার জন্য, কিন্তু উহা অবশেষে তাঁহাকে জানাইয়া দেয় যে, তিনি প্রকৃতিতে অবস্থিত নহেন, কিন্তু প্রকৃতি হইতে নিত্যস্বতন্ত্র। জ্ঞানী সমুদয় ত্যাগ করেন, কারণ, জ্ঞান শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কোনকালেই প্রকৃতির অস্তিত্ব নাই। আমরা ইহাও দেখিয়াছি, এই সকল উচ্চতর বিষয়ে 'ইহাতে কি লাভ'—এ প্রশ্ন করাই যাইতে পারে না। লাভালাভের প্রশ্ন জিজ্ঞাসাই এখানে অস্বাভাবিক আর যদিই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়, তাহা হইলেও আমরা ঐ প্রশ্নটী উত্তমরূপে বিশ্লেষণ করিয়া কি পাই? লাভ মানে কি? না—সুখ—যে জিনিষে লোকের সাংসারিক অবস্থার উন্নতি সাধন না করে, যাহাতে তাহার সুখ বৃদ্ধি না করে, তদপেক্ষা যাহাতে তাহার বেশী সুখ, তাহাতেই তাহার

বেশী লাভ, বেশী হিত। সমুদয় বিজ্ঞান ঐ এক লক্ষ্য সাধনে অর্থাৎ মনুষ্যজাতিকে সুখী করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে আর যাহাতে বেশী পরিমাণ সুখ আনয়ন করে, মানুষ তাহাই গ্রহণ করিয়া যাহাতে অল্প সুখ, সেটী ত্যাগ করে। আমরা দেখিয়াছি, সুখ হয় দেহে বা মনে অথবা আত্মায় অবস্থিত। পশুদিগের এবং পশুপ্রায় অনুন্নত মনুষ্যগণের সমুদয় সুখ দেহে। একটা ক্ষুধার্ত্ত কুক্কুর বা ব্যাঘ্র যেরূপ তৃপ্তির সহিত আহার করে, কোন মানুষ তাহা পারে না। সুতরাং কুক্কুর ও ব্যাঘ্রের সুখের আদর্শ সম্পূর্ণরূপে দেহগত। মানুষে আমরা একটু উচ্চস্তরের সুখ দেখিয়া থাকি—মানুষ জ্ঞানালোচনায় সুখী হইয়া থাকে। সর্ব্বোচ্চস্তরের সুখ জ্ঞানীর—তিনি আত্মানন্দে বিভোর থাকেন। আত্মাই তাঁহার সুখের একমাত্র উপকরণ। অতএব জ্ঞানীর পক্ষে এই আত্মজ্ঞানই পরম লাভ বা হিত; কারণ, ইহাতেই তিনি পরম সুখ পাইয়া থাকেন। জড় বিষয়সমূহ বা ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা তাঁহার নিকট সর্ব্বোচ্চ লাভের বিষয় হইতে পারে না, কারণ, তিনি জ্ঞানে যেরূপ সুখ পাইয়া থাকেন, উহাতে তদ্রূপ পান না। আর প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানই সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য, আর আমরা যত প্রকার সুখের বিষয় অবগত আছি, তন্মধ্যে উহাই সর্ব্বোচ্চ সুখ। যাহারা অজ্ঞানে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহারা দেবগণের পশুতুল্য। এখানে দেব অর্থে জ্ঞানী ব্যক্তিকে বুঝিতে হইবে। যে সকল ব্যক্তি যন্ত্রবৎ কার্য্য ও পরিশ্রম করিয়া থাকে, তাহারা প্রকৃত পক্ষে জীবনটাকে

সম্ভোগ করে না, জ্ঞানী ব্যক্তিই জীবনটাকে সম্ভোগ করেন। একজন বড়লোক হয় ত এক লক্ষ টাকা খরচ করিয়া একখানা ছবি কিনিল, কিন্তু যে শিল্প বুঝিতে পারে, সেই উহা সম্ভোগ করিবে। ক্রেতা যদি শিল্পজ্ঞানশূন্য হয়, তবে তাহার পক্ষে উহা নিরর্থক, সে কেবল উহার অধিকারী মাত্র। সমগ্র জগতের মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তিই কেবল জগতের সুখ সম্ভোগ করেন। অজ্ঞানী ব্যক্তি কখনই সুখভোগ করিতে পায় না, তাহাকে অজ্ঞাতসারেও অপরের জন্য পরিশ্রম করিতে হয়।

এ পর্য্যন্ত আমরা অদ্বৈতবাদীদের সিদ্ধান্তসমূহ দেখিয়া আসিলাম, দেখিলাম—তাঁহাদের মতে একমাত্র আত্মা আছে, দুই আত্মা পর্য্যন্ত থাকিতে পারে না। আমরা দেখিলাম—সমগ্র জগতে এক, সত্তামাত্র বিদ্যমান আর সেই এক সত্তা ইন্দ্রিয়গণের ভিতর দিয়া দৃষ্ট হইলে উহাকেই এই জড় জগৎ বলিয়া বোধ হয়। যখন কেবল মনের ভিতর দিয়া উহা দৃষ্ট হয়, তখন উহাকে চিন্তা ও ভাবজগৎ বলে আর যখন উহার যথার্থ স্বরূপ জ্ঞান হয়, তখন উহা এক অনন্ত পুরুষ বলিয়া প্রতীত হয়। এই বিষয়টী আপনারা বিশেষরূপ স্মরণে রাখিবেন—ইহা বলা ঠিক নহে যে, মানুষের ভিতর একটী আত্মা আছে, যদিও বুঝাইবার জন্য প্রথমে আমাকে ঐরূপ ধরিয়া লইতে হইয়াছিল। বাস্তবিক পক্ষে কেবল এক সত্তা রহিয়াছে এবং সেই সত্তা আত্মা—আর তাহাই যখন ইন্দ্রিয়গণের ভিতর দিয়া অনুভূত হয়, তখন তাহাকেই দেহ বলে, যখন উহা চিন্তা

বা ভাবের মধ্য দিয়া অনুভূত হয়, তখন উহাকেই মন বলে, আর যখন উহা স্বস্বরূপে উপলব্ধ হয়, তখন উহা আত্মারূপে, সেই এক অদ্বিতীয় সত্তারূপে প্রতীত হয়। অতএব ইহা ঠিক নহে যে, এক জায়গায় দেহ, মন ও আত্মা—এই তিনটী জিনিষ রহিয়াছে—যদিও বুঝাইবার সময় ঐরূপে ব্যাখ্যা করাতে বুঝাইবার পক্ষে বেশ সহজ হইয়াছিল—কিন্তু সবই সেই আত্মা আর সেই এক পুরুষই বিভিন্ন দৃষ্টি অনুসারে কখন দেহ কখন মন ও কখন বা আত্মারূপে কথিত হইয়া থাকে। একমাত্র পুরুষই আছেন, অজ্ঞানীরা তাঁহাকেই জগৎ বলিয়া থাকে। যখন সেই ব্যক্তিই জ্ঞানে অপেক্ষাকৃত উন্নত হয়, তখন সে সেই পুরুষকেই ভাবজগৎ বলিয়া থাকে। আর যখন পূর্ণ জ্ঞানোদয়ে সমুদয় ভ্রম উড়িয়া যায়, তখন মানব দেখিতে পায়, এ সমুদয়ই আত্মা ব্যতীত আর কিছু নহে। চরম সিদ্ধান্ত এই যে, 'আমিই সেই এক সত্তা'। জগতে দুটী তিনটী সত্তা নাই, সবই এক। সেই এক সত্তাই মায়ার প্রভাবে বহুরূপে দৃষ্ট হইতেছে, যেমন অজ্ঞানবশতঃ রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়া থাকে। সেই দড়িটাকেই সাপ বলিয়া দেখায়। এখানে একটা দড়ি আলাদা ও সাপ আলাদা—দুটী পৃথক্ বস্তু নাই। কেহই তথায় দুটী বস্তু দেখে না। দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ বেশ সুন্দর দার্শনিক পারিভাষিক শব্দ হইতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ অনুভূতির সময় আমরা এক সময়েই সত্য ও মিথ্যা কখনই দেখিতে পাই না। আমরা সকলে জন্ম হইতেই

অদ্বৈতবাদী, উহা হইতে পলাইবার উপায় নাই। আমরা সকল সময়েই এক দেখিয়া থাকি। যখন আমরা রজ্জু দেখি, তখন মোটেই সর্প দেখি না, আবার যখন সর্প দেখি, তখন মোটেই রজ্জু দেখি না—উহা তখন উড়িয়া যায়। যখন আপনাদের ভ্রম দর্শন হয়, তখন আপনারা যথার্থ মানুষদের দেখেন না। মনে করুন, দূর হইতে রাস্তায় আপনার একজন বন্ধু আসিতেছেন। আপনি তাঁহাকে অতি উত্তমরূপে জানেন, কিন্তু আপনার সমক্ষে কুজ্ঝটিকা থাকাতে আপনি তাঁহাকে অন্য লোক বলিয়া মনে করিতেছেন। যখন আপনি আপনার বন্ধুকে অপর লোক বলিয়া মনে করিতেছেন, তখন আপনি আর আপনার বন্ধুকে দেখিতেছেন না, তিনি অন্তর্হিত হইয়াছেন। আপনি একটি মাত্র লোককে দেখিতেছেন। মনে করুন, আপনার বন্ধুকে 'ক' বলিয়া অভিহিত করা গেল। তাহা হইলে আপনি যখন 'ক'কে 'খ' বলিয়া দেখিতেছেন, তখন আপনি 'ক'কে আদতেই দেখিতেছেন না। এইরূপ সকল স্থলে আপনাদের একেরই উপলব্ধি হইয়া থাকে। যখন আপনি আপনাকে দেহরূপে দর্শন করেন, তখন আপনি দেহমাত্র, আর কিছুই নহেন আর জগতের অধিকাংশ মানবেরই এইরূপ উপলব্ধি। তাহারা আত্মা মন ইত্যাদি কথা মুখে বলিতে পারে, কিন্তু তাহারা দেখে এই স্থূল ভৌতিক আকৃতিটা—স্পর্শ, দর্শন, আস্বাদ ইত্যাদি। আবার কোন কোন লোক তাঁহাদের জ্ঞানভূমির বিশেষপ্রকার অবস্থায় আপনাদিগকে চিন্তা বা ভাবরূপে অনুভব করিয়া

থাকেন। আপনারা অবশ্য স্যর হম্ফি ডেভি সম্বন্ধে যে গল্প কথিত হইয়া থাকে, তাহা জানেন। তিনি তাঁহার ক্লাসে হাস্য-জনক বাষ্প (Laughing gas) লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন। হঠাৎ একটা নল ভাঙ্গিয়া ঐ বাষ্প বাহির হইয়া যায় ও তিনি নিঃশ্বাসযোগে উহা গ্রহণ করেন। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য তিনি প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। অবশেষে তিনি ক্লাসের ছেলেদের বলিলেন, যখন আমি ঐ অবস্থায় ছিলাম, আমি বাস্তবিক অনুভব করিতেছিলাম যে, সমগ্র জগৎ চিন্তা বা ভাব-গঠিত। ঐ বাষ্পের শক্তিতে কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার দেহজ্ঞান বিস্মরণ হইয়াছিল, আর যাহা পূর্ব্বে তিনি শরীর বলিয়া দেখিতেছিলেন, তাহাই এক্ষণে চিন্তা বা ভাবসমূহরূপে দেখিতে পাইলেন। যখন অনুভূতি আরও উচ্চতর অবস্থায় যায়, যখন এই ক্ষুদ্র অহংজ্ঞানকে চিরদিনের মত অতিক্রম করা যায়, তখন সকলের পশ্চাতে যে সত্য বস্তু রহিয়াছে, তাহা প্রকাশ পাইতে থাকে। উহাকে তখন আমরা অখণ্ড সচ্চিদানন্দরূপে—সেই এক আত্মারূপে—অনন্ত পুরুষরূপে দর্শন করি।

জ্ঞানী ব্যক্তি সমাধিকালে অনির্ব্বচনীয়, নিত্যবোধ, কেবলা-নন্দ, নিরুপম, অপার, নিত্যমুক্ত, নিষ্ক্রিয়, অসীম, গগনসম, নিষ্কল, নির্ব্বিকল্প পূর্ণব্রহ্মমাত্র হৃদয়ে সাক্ষাৎ করেন।*

---

* কিমপি সততবোধং কেবলানন্দরূপং
নিরুপমমতিবেলং নিত্যমুক্তং নিরীহং।
নিরবধি গগনাভং নিষ্কলং নির্ব্বিকল্পং
হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্মপূর্ণং সমাধৌ॥ বিবেকচূড়ামণি ।৪১০।

অদ্বৈত মতে এই সমস্ত বিভিন্নপ্রকার স্বর্গনরকের এবং আমরা সকল ধর্ম্মে যে নানাবিধ ভাব দেখিতে পাই, এ সকলের কিরূপে ব্যাখ্যা করে? যখন মানুষের মৃত্যু হয়, কথিত হইয়া থাকে যে, সে স্বর্গে বা নরকে যায়, এখানে ওখানে নানাস্থানে যায় অথবা স্বর্গে বা অন্য কোন লোকে দেহধারণ করিয়া জন্মপরিগ্রহ করে। অদ্বৈতবাদী বলেন, এ সমুদয়ই ভ্রম। প্রকৃতপক্ষে কেহই জন্মায়ও না, মরেও না। স্বর্গও নাই, নরকও নাই অথবা ইহলোকও নাই। এই তিনটীরই কোন কালেই অস্তিত্ব নাই। একটী ছেলেকে অনেক ভূতের গল্প বলিয়া সন্ধ্যাবেলা তাহাকে বাহিরে যাইতে বল। একটা স্থাণু রহিয়াছে। বালক কি দেখে? সে দেখে—একটা ভূত হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিতে আসিতেছে। মনে করুন, একজন প্রণয়ী রাস্তার এক কোণ হইতে তাহার প্রণয়িনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছে—সে সেই স্থাণুটীকে তাহার প্রণয়িনী মনে করে। একজন পাহারাওয়ালা উহাকে চোর বলিয়া মনে করিবে, আবার চোর উহাকে পাহারাওয়ালা ঠাওরাইবে। সেই একই স্থাণু বিভিন্নরূপে দৃষ্ট হইতেছে। স্থাণুটীই সত্য আর এই যে বিভিন্নভাবে উহার দর্শন—তাহা কেবল নানাপ্রকার মনের বিকার মাত্র। একমাত্র পুরুষ—এই আত্মাই আছেন। তিনি কোথাও যানও না, আসেনও না। অজ্ঞান মানব স্বর্গ বা তথাবিধ স্থানে যাইবার বাসনা করে, সারা জীবন সে কেবল ক্রমাগত উহারই চিন্তা করিয়াছে। এই পৃথিবীর স্বপ্ন যখন তাহার চলিয়া যায়, তখন সে এই জগৎকেই

স্বর্গরূপে দেখিতে পায়—দেখে যে, এথায় দেববৃন্দ বিরাজ করিতেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি কোন ব্যক্তি সারা জীবন তাহার পূর্ব্বপিতৃপুরুষদিগকে দেখিতে চায়, সে আদম হইতে আরম্ভ করিয়া সকলকেই দেখিতে পায়, কারণ, সে স্বয়ংই উহা-দিগকে সৃষ্টি করিয়া থাকে। যদি কেহ আরো অধিক অজ্ঞান হয় এবং গোঁড়ারা চিরকাল তাহাকে নরকের ভয় দেখাইয়া থাকে, তবে সে মৃত্যুর পর এই জগৎকেই নরকরূপে দর্শন করে, আর ইহাও দেখে যে, তথায় লোকে নানাবিধ শাস্তিভোগ করিতেছে। মৃত্যু বা জন্মের আর কিছুই অর্থ নহে, কেবল দৃষ্টির পরিবর্ত্তন। আপনিও কোথাও যান না বা আপনি যাহার উপর আপনার দৃষ্টিক্ষেপ করেন, তাহাও কোথাও যায় না। আপনি ত নিত্য, অপরিণামী। আপনার আবার যাওয়া আসা কি? ইহা অসম্ভব। আপনি ত সর্ব্বব্যাপী। আকাশ কখন গতিশীল নহে, কিন্তু উহার উপরে মেঘ এদিক্ ওদিকে যাইয়া থাকে—আমরা মনে করি, আকাশই গতিশীল হইয়াছে। রেলগাড়ী চড়িয়া যাইবার সময় যেমন পৃথিবীকে গতিশীল বোধ হয়, এও ঠিক তদ্রূপ। বাস্তবিক ত পৃথিবী নড়িতেছে না, রেলগাড়ীই চলিতেছে। এইরূপ আপনি যেখানে ছিলেন, সেখানেই আছেন, কেবল এই সকল বিভিন্ন স্বপ্ন, মেঘসমূহের ন্যায় এদিক্ ওদিকে যাইতেছে। একটা স্বপ্নের পর আর একটা স্বপ্ন আসিতেছে—উহাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই। এই জগতে নিয়ম বা সম্বন্ধ বলিয়া কিছু নাই, কিন্তু আমরা ভাবিতেছি, পরস্পর যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। আপনারা

সকলেই সম্ভবতঃ 'এলিসের অদ্ভুত দেশ দর্শন' (Alice in Wonderland) নামক গ্রন্থ পড়িয়াছেন। আমি ঐ বইখানি পড়িয়া বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছিলাম—আমার মাথায় বরাবর ছেলেদের জন্য ঐরূপ বই লেখার ইচ্ছা ছিল। আমার উহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছিল এই যে, আপনারা যাহা সর্ব্বাপেক্ষা অসঙ্গত জ্ঞান করেন, তাহাই উহার মধ্যে আছে—কোনটীর সহিত কোনটীর কোন সম্বন্ধ নাই। একটা ভাব আসিয়া যেন আর একটার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িতেছে—পরস্পরে কোন সম্বন্ধ নাই। যখন আপনারা শিশু ছিলেন, আপনারা ভাবিতেন, উহাদের মধ্যে অদ্ভুত সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই লোকটী তাঁহার শৈশবাবস্থার চিন্তাগুলি—শৈশবাবস্থায় যাহা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া বোধ হইত, তাহাই লইয়া শিশুদিগের জন্য এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। আর অনেকে ছেলেদের জন্য যে সব গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে তাঁহারা বড় হইলে তাঁহাদের যে সকল চিন্তা ও ভাব আসিয়াছে, সেইগুলি ছেলেদের গেলাইবার চেষ্টা করেন—কিন্তু ঐ বইগুলি ছেলেদের কিছুমাত্র উপযোগী নহে—বাজে অনর্থক লেখামাত্র। যাহা হউক, আমরাও সকলেই—বয়ঃপ্রাপ্ত শিশুমাত্র। আমাদের জগৎও ঐরূপ অসম্বদ্ধ জিনিষমাত্র—ঐ এলিসের অদ্ভুত রাজ্য—কোনটীর সহিত কোনটীর কোনপ্রকার সম্বন্ধ নাই। আমরা যখন কয়েকবার ধরিয়া কতকগুলি ঘটনাকে একটী নির্দ্দিষ্ট ক্রমানুসারে ঘটিতে দেখি, আমরা তাহাকেই কার্য্যকারণ নামে অভিহিত করি, আর

বলি যে, উহা আবার ঘটিবে। যখন এই স্বপ্ন চলিয়া গিয়া তাহার স্থলে অন্য স্বপ্ন আসিবে, তাহাকেও ইহারই মত সম্বন্ধযুক্ত বোধ হইবে। স্বপ্নদর্শনের সময় আমরা যাহা কিছু দেখি, সবই সম্বন্ধ-যুক্ত বলিয়া বোধ হয়, স্বপ্নাবস্থায় আমরা সেগুলিকে কখনই অসম্বন্ধ বা অসঙ্গত মনে করি না—কেবল যখনই জাগিয়া উঠি, তখনই সম্বন্ধের অভাব দেখিতে পাই। এইরূপ যখন আমরা এই জগৎরূপ স্বপ্নদর্শন হইতে জাগিয়া উঠিয়া ঐ স্বপ্নকে সত্যের সহিত তুলনা করিয়া দেখিব, তখন উহা সমুদয়ই অসম্বন্ধ ও নিরর্থক বলিয়া প্রতিভাত হইবে—কতকগুলা অসম্বন্ধ জিনিষ যেন আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল—কোথা হইতে আসিল, কোথায় যাইতেছে, কিছুই জানি না। কিন্তু আমরা জানি যে, উহা শেষ হইবে। আর ইহাকেই মায়া বলে। এই সমুদয় পরিণামশীল বস্তু—রাশি রাশি গতিশীল ঊর্ণাপুঞ্জবৎ কাদম্বিনী-জালের ন্যায় আর সেই অপরিণামী সূর্য্য আপনি স্বয়ং। যখন আপনি সেই অপরিণামী সত্তাকে বাহির হইতে দেখেন, তখন তাহাকে আপনি ঈশ্বর বলেন আর ভিতর হইতে দেখিলে উহাকে আপনার নিজ আত্মা বা স্বরূপ বলিয়া দেখেন। উভয়ই এক। আপনা হইতে পৃথক্ ঈশ্বর নাই, আপনা হইতে—যথার্থ যে আপনি—তাহা হইতে শ্রেষ্ঠতর ঈশ্বর নাই—সকল ঈশ্বর বা দেবতাই আপনার তুলনায় ক্ষুদ্রতর, ঈশ্বর, স্বর্গস্থ পিতা প্রভৃতির সমুদয় ধারণা আপনারই প্রতিবিম্বমাত্র। ঈশ্বর স্বয়ংই আপনার প্রতিবিম্ব বা প্রতিমাস্বরূপ। 'ঈশ্বর মানবকে নিজ প্রতিবিম্ব-

রূপে সৃষ্টি করিলেন'—এ কথা ভুল। মানুষ ঈশ্বরকে নিজ প্রতিবিম্বানুযায়ী সৃষ্টি করে—এই কথাই সত্য। সমুদয় জগতের মধ্যেই আমরা আমাদের প্রতিবিম্বানুযায়ী ঈশ্বর বা দেবগণের সৃষ্টি করিতেছি। আমরাই দেবতা সৃষ্টি করি, তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া তাঁহার উপাসনা করি, আর যখনই এই স্বপ্ন আমাদিগের নিকট আসিয়া থাকে, তখন আমরা উহাকে ভাল বাসিয়া থাকি।

এই বিষয়টী বুঝিয়া রাখা বিশেষ প্রয়োজন যে, অদ্যকার প্রাতের বক্তৃতার সার কথাটা এই যে, একটী সত্তামাত্রই আছে আর সেই এক সত্তাই বিভিন্ন মধ্যবর্ত্তী বস্তুর মধ্য দিয়া দৃষ্ট হইলে তাহাকেই পৃথিবী বা স্বর্গ বা নরক বা ঈশ্বর বা ভূতপ্রেত বা মানব বা দৈত্য বা জগৎ বা এই সমুদয় যাহা কিছু বোধ হয়। কিন্তু এই সমুদয় বিভিন্ন পরিণামী বস্তুর মধ্যে যাঁহার কখন পরিণাম হয় না—যিনি এই চঞ্চল মর্ত্ত্য জগতের একমাত্র জীবনস্বরূপ, যে এক পুরুষ বহু ব্যক্তির কাম্যবস্তু বিধান করিতেছেন, তাঁহাকে যে সকল ধীর ব্যক্তি নিজ আত্মার মধ্যে অবস্থিত বলিয়া দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য শান্তিলাভ হয়—আর কাহারও নহে।*

সেই এক সত্তার সাক্ষাৎকার করিতে হইবে। কিরূপে তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি হইবে—কিরূপে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হইবে, ইহাই এক্ষণে জিজ্ঞাস্য। কিরূপে এই স্বপ্ন ভঙ্গ হইবে, আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরনারী—আমাদের ইহা চাই, ইহা করিতে

* কঠোপনিষদ্, ৫ম বল্লী, ১৩শ শ্লোক দেখুন।

হইবে, এই যে স্বপ্ন—ইহা হইতে কিরূপে আমরা জাগিব? আমরাই জগতের সেই অনন্ত পুরুষ আর আমরা জড়ভাবাপন্ন হইয়া এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরনারীরূপ ধারণ করিয়াছি—এক জনের মিষ্ট কথায় গলিয়া যাইতেছি আবার আর এক জনের কড়া কথায় গরম হইয়া পড়িতেছি—ভালমন্দ সুখদুঃখ আমাদিগকে নাচাইতেছে! কি ভয়ানক নির্ভরতা, কি ভয়ানক দাসত্ব! আমি—যে সকল সুখদুঃখের অতীত, সমগ্র জগতই যাহার প্রতিবিম্বস্বরূপ—সূর্য্য চন্দ্র তারা যাহার মহাপ্রাণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎসমাত্র, আমি এইরূপ ভয়ানক দাসভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছি! আপনি আমার গায়ে একটা চিমটি কাটিলে আমার লাগিয়া থাকে। কেহ যদি একটী মিষ্ট কথা বলে, অমনি আমার আনন্দ হইতে থাকে। আমার কি দুর্দ্দশা দেখুন—দেহের দাস, মনের দাস, জগতের দাস, একটা ভাল কথার দাস, একটা মন্দ কথার দাস, বাসনার দাস, সুখের দাস, জীবনের দাস, মৃত্যুর দাস—সব জিনিষের দাস! এই দাসত্ব ঘুচাইতে হইবে কিরূপে?

এই আত্মার সম্বন্ধে প্রথমে শুনিতে হইবে, তৎপরে উহা লইয়া মনন অর্থাৎ বিচার করিতে হইবে, তৎপরে উহার নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধ্যান করিতে হইবে।*

অদ্বৈতজ্ঞানীর ইহাই সাধন-প্রণালী। সত্যের সম্বন্ধে প্রথমে শুনিতে হইবে, পরে উহার বিষয় চিন্তা করিতে হইবে, তৎপরে ক্রমাগত সেইটী মনে মনে দৃঢ়ভাবে বলিতে হইবে। সর্ব্বদাই

* বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৫ম অধ্যায়, ৬ষ্ঠ শ্লোক দেখুন।

ভাবুন—'আমি ব্রহ্ম'—অন্য সমুদয় চিন্তাকে দুর্ব্বলতাজনক বলিয়া দূর করিয়া দিতে হইবে। যে কোন চিন্তায় আপনাদিগকে নরনারী বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহা দূর করিয়া দিন্। দেহ যাক্, মন যাক্, দেবতারাও যাক্, ভূত প্রেতাদিও যাক্, সেই এক সত্তা ব্যতীত আর সবই যাক্।

যেখানে একজন অপরকে দেখে, একজন অপর কিছু শুনে, একজন অন্য কিছু জানে, তাহা ক্ষুদ্র বা সসীম; আর যেখানে একজন অপরকে দেখে না, একজন অপর কিছু শুনে না, একজন অপর কিছু জানে না, তাহাই ভূমা অর্থাৎ মহান্ বা অনন্ত।*

তাহাই সর্ব্বোত্তম বস্তু, যেখানে বিষয়ী ও বিষয় এক হইয়া যায়। যখন আমিই শ্রোতা ও আমিই বক্তা, যখন আমিই আচার্য্য ও আমিই শিষ্য, যখন আমিই স্রষ্টা ও আমিই সৃষ্ট, তখনই কেবল ভয় চলিয়া যায়। কারণ, আমাকে ভীত করিবার অপর কেহ বা কিছু নাই। আমি ব্যতীত যখন আর কিছুই নাই, তখন আমাকে ভয় দেখাইবে কিসে? দিনের পর দিন এই তত্ত্ব শুনিতে হইবে। অন্য সমুদয় চিন্তা দূর করিয়া দিন। আর সমুদয় দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিন, নিরন্তর ইহা আবৃত্তি করুন। যতক্ষণ না উহা হৃদয়ে পঁহুছে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না প্রত্যেক স্নায়ু, প্রত্যেক মাংসপেশী, এমন কি, প্রত্যেক শোণিতবিন্দু পর্য্যন্ত আমিই

---

* 'যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্ বিজানাতি স ভূমা অথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্ বিজানাতি তদল্পং।"

—ছান্দোগ্যোপনিষৎ—৭ম প্রপাঠক, ২৪ খণ্ড।

সেই, আমিই সেই, এই ভাবে পূর্ণ হইয়া যায়, ততক্ষণ কর্ণের ভিতর দিয়া ঐ তত্ত্ব ক্রমাগত ভিতরে প্রবেশ করাইতে হইবে। এমন কি, মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াও বলুন—আমিই সেই। ভারতে এক সন্ন্যাসী ছিলেন—তিনি শিবোঽহং শিবোঽহং আবৃত্তি করিতেন। একদিন একটা ব্যাঘ্র আসিয়া তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়িল ও তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া মারিয়া ফেলিল। যতক্ষণ তিনি জীবিত ছিলেন, ততক্ষণ শিবোঽহং শিবোঽহং ধ্বনি শুনা গিয়াছিল। মৃত্যুর দ্বারে, ঘোরতর বিপদে, রণক্ষেত্রে, সমুদ্রতলে, উচ্চতম পর্ব্বতশিখরে, গভীরতম অরণ্যে, যেখানেই পড়ুন না কেন, সর্ব্বদা আপনাকে বলিতে থাকুন—আমিই সেই, আমিই সেই। দিনরাত্রি বলিতে থাকুন—আমিই সেই। ইহা শ্রেষ্ঠতম তেজের পরিচয়, ইহাই ধর্ম্ম।

দুর্ব্বল ব্যক্তি কখন আত্মাকে লাভ করিতে পারে না।* কখনই বলিবেন না, 'হে প্রভো, আমি অতি অধম পাপী'। কে আপনাকে সাহায্য করিবে? আপনি জগতের সাহায্যকর্ত্তা—আপনাকে আবার এ জগতে কিসে সাহায্য করিতে পারে? আপনাকে সাহায্য করিতে কোন্ মানব, কোন্ দেবতা বা কোন্ দৈত্য সক্ষম? আপনার উপর আবার কাহার শক্তি খাটিবে? আপনিই জগতের ঈশ্বর—আপনি আবার কোথায় সাহায্য অন্বেষণ

* নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

—মুণ্ডক উপনিষদ্।৩।২।৪

করিবেন? যাহা কিছু সাহায্য পাইয়াছেন, আপনার নিজের নিকট হইতে ব্যতীত আর কাহারও নিকট পান নাই। আপনি প্রার্থনা করিয়া যাহার উত্তর পাইয়াছেন, অজ্ঞতাবশতঃ আপনি মনে করিয়াছেন, অপর কোন পুরুষ তাহার উত্তর দিয়াছে, কিন্তু অজ্ঞাতসারে আপনি স্বয়ংই সেই প্রার্থনার উত্তর দিয়াছেন। আপনার নিকট হইতেই সাহায্য আসিয়াছিল, আর আপনি সাগ্রহে কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন যে, অপর কেহ আপনাকে সাহায্য প্রেরণ করিতেছে। আপনার বাহিরে আপনার সাহায্যকর্ত্তা আর কেহ নাই—আপনিই জগতের স্রষ্টা। গুটিপোকার স্থায় আপনিই আপনার চারিদিকে গুটি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কে আপনাকে উদ্ধার করিবে? আপনার ঐ গুটিটি কাটিয়া ফেলিয়া সুন্দর প্রজাপতিরূপে—মুক্ত আত্মারূপে বাহির হইয়া আসুন। তখনই, কেবল তখনই আপনি সত্য দর্শন করিবেন। সর্ব্বদা আপন মনকে বলিতে থাকুন, আমিই সেই। এই বাক্যগুলি আপনার মনের অপবিত্রতারূপ আবর্জ্জনারাশিকে পুড়াইয়া ফেলিবে, উহাতেই আপনার ভিতরে পূর্ব্ব হইতেই যে মহাশক্তি অবস্থিত আছে, তাহাকে প্রকাশ করিয়া দিবে, উহাতেই আপনার হৃদয়ে যে অনন্ত শক্তি সুপ্তভাবে রহিয়াছে, তাহাকে জাগাইবে। সর্ব্বদাই সত্য—কেবলমাত্র সত্য—শ্রবণ করিয়াই এই মহাশক্তির উদ্বোধন করিতে হইবে। যেখানে দুর্ব্বলতার চিন্তা বিদ্যমান, সেই স্থানের দিকে ঘেঁসিবেন না। যদি জ্ঞানী হইতে চান, সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা পরিহার করুন।

সাধন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে মনে যত প্রকার সন্দেহ আসিতে পারে, সব ভঞ্জন করিয়া লউন। যুক্তি তর্ক বিচার যতদূর করিতে পারেন, করুন। তারপর যখন মনের মধ্যে স্থির সিদ্ধান্ত করিবেন যে, ইহাই এবং কেবলমাত্র ইহাই সত্য, আর কিছু নহে, তখন আর তর্ক করিবেন না, তখন মুখ একেবারে বন্ধ করুন। তখন আর তর্কযুক্তি শুনিবেন না, নিজেও তর্ক করিবেন না। আর তর্কযুক্তির প্রয়োজন কি? আপনি ত বিচার করিয়া তৃপ্তি-লাভ করিয়াছেন, আপনি ত সমস্যার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এখন তবে আর বাকি কি? এখন সত্যের সাক্ষাৎকার করিতে হইবে। অতএব বৃথা তর্কে আর অমূল্য কালহরণে কি ফল? এক্ষণে ঐ সত্যকে ধ্যান করিতে হইবে, আর যে কোন চিন্তায় আপনাকে তেজস্বী করে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে এবং যাহাতে দুর্ব্বল করে, তাহাকেই পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভক্ত মূর্ত্তি প্রতিমাদি এবং ঈশ্বরের ধ্যান করেন। ইহাই স্বাভাবিক সাধনপ্রণালী, কিন্তু ইহাতে অতি মৃদু গতিতে অগ্রসর হইতে হয়। যোগীরা তাঁহার দেহের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন কেন্দ্র বা চক্রের উপর ধ্যান করেন ও মনোমধ্যস্থ শক্তিসমূহের পরিচালনা করেন। জ্ঞানী বলেন, মনেরও অস্তিত্ব নাই, দেহেরও নাই। এই দেহ ও মনের চিন্তাকে দূর করিয়া দিতে হইবে, অতএব উহাদের চিন্তা করা অজ্ঞানোচিত কার্য্য। উহা যেন একটা রোগ আনিয়া আর একটা রোগ আরোগ্য করার মত। অতএব তাঁহার ধ্যানই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন—নেতি নেতি; তিনি সকল বস্তুর অস্তিত্বই নিরাস করেন,

আর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা আত্মা। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্লেষণাত্মক (বিলোম) সাধন। জ্ঞানী কেবলমাত্র বিশ্লেষণ-বলে জগৎটাকে আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহেন। 'আমি জ্ঞানী' এ কথা বলা খুব সহজ, কিন্তু যথার্থ জ্ঞানী হওয়া বড়ই কঠিন। বেদ বলিতেছেন,—

পথ অতি দীর্ঘ, এ যেন শাণিত ক্ষুরধারার উপর দিয়া ভ্রমণ; কিন্তু নিরাশ হইও না। উঠ, জাগো, যতদিন না সেই চরম লক্ষ্যে পঁহুছিতেছ, ততদিন ক্ষান্ত হইও না। *

অতএব জ্ঞানীর ধ্যান কি প্রকার হইল? জ্ঞানী দেহ মন বিষয়ক সর্ব্বপ্রকার চিন্তাকে অতিক্রম করিতে চাহেন। তিনি যে দেহ, এই ধারণাকে দূর করিয়া দিতে চাহেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, যখনই আমি বলি, আমি অমুক স্বামী, তৎক্ষণাৎ দেহের ভাব আসিয়া থাকে। তবে কি করিতে হইবে? মনের উপর বলপূর্ব্বক আঘাত করিয়া বলিতে হইবে, 'আমি দেহ নই, আমি আত্মা'। রোগই আসুক, অথবা অতি ভয়াবহ আকারে মৃত্যু আসিয়াই উপস্থিত হউক, কে গ্রাহ্য করে? আমি দেহ নহি। দেহ সুন্দর রাখিবার চেষ্টা কেন? এই মায়া, এই ভ্রান্তি আবার সম্ভোগের জন্য? এই দাসত্ব বজায় রাখিবার জন্য? দেহ যাউক, আমি দেহ নহি। ইহাই জ্ঞানীর সাধনপ্রণালী। ভক্ত বলেন,

* "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥"
—কঠ উপনিষদ্। ১।৩।১৪

"প্রভু আমাকে এই জীবনসমুদ্র সহজে উত্তীর্ণ হইবার জন্য এই দেহ দিয়াছেন, অতএব যত দিন না যাত্রা শেষ হয়, ততদিন ইহাকে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিতে হইবে।" যোগী বলেন, "আমাকে দেহের যত্ন অবশ্যই করিতে হইবে, যাহাতে আমি ধীরে ধীরে সাধন পথে অগ্রসর হইয়া পরিণামে মুক্তিলাভ করিতে পারি।" জ্ঞানী মনে করেন, আমি আর বিলম্ব করিতে পারি না। আমি এই মুহূর্ত্তেই চরম লক্ষ্যে পঁহুছিব। তিনি বলেন, "আমি নিত্যমুক্ত, কোন কালেই আমি বদ্ধ নহি; আমি অনন্তকাল ধরিয়া এই জগতের ঈশ্বর। আমাকে আবার পূর্ণ কে করিবে? আমি নিত্য পূর্ণস্বরূপ।" যখন কোন মানব স্বয়ং পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, সে অপরেও পূর্ণতা দেখিয়া থাকে। লোকে যখন অপরের মধ্যে অপূর্ণতা দেখে, তখন তাহার নিজ মনেরই ছাপ উহার উপর পড়াতে সে ঐরূপ দেখিতেছে, বুঝিতে হইবে। তাহার নিজের ভিতর যদি অপূর্ণতা না থাকে, তবে সে কিরূপে অপূর্ণতা দেখিবে? অতএব জ্ঞানী পূর্ণতা অপূর্ণতা কিছুই গ্রাহ্য করেন না। তাঁহার পক্ষে উহাদের কিছুই অস্তিত্ব নাই। যখনই তিনি মুক্ত হন, তিনি আর ভালমন্দ দেখেন না। ভালমন্দ কে দেখে? যাহার নিজের ভিতর ভালমন্দ আছে। অপরের দেহ কে দেখে? যে নিজেকে দেহ মনে করে। যে মুহূর্ত্তে আপনি দেহ-ভাবরহিত হইবেন, সেই মুহূর্ত্তেই আর আপনি জগৎ দেখিতে পাই-বেন না। উহা চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। জ্ঞানী কেবল বিচারজনিত সিদ্ধান্তবলে এই জড়বন্ধন হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করেন। ইহাই 'নেতি' 'নেতি' মার্গ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

আত্মার একত্ব।

পূর্ব্ব বক্তৃতায় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা দৃঢ়তর করিবার জন্য আমি একখানি উপনিষদ্* হইতে কিছু পাঠ করিয়া শুনাইব। তাহাতে দেখিবেন, অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে কিরূপে এই সকল তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হইত।

যাজ্ঞবল্ক্য নামে একজন মহর্ষি ছিলেন। আপনারা অবশ্য জানেন যে, ভারতে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইলে সকলকেই সংসার ত্যাগ করিতে হইবে। সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণের সময় উপস্থিত হইলে তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন—

"প্রিয়ে মৈত্রেয়ী, আমি সংসার ত্যাগ করিয়া চলিলাম, এই আমার যাহা কিছু অর্থ, বিষয় সম্পত্তি বুঝিয়া লও।"

মৈত্রেয়ী বলিলেন, "ভগবন্, যদি আমি ধনরত্নে পূর্ণা সমুদয় পৃথিবী প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে তাহার দ্বারা কি আমি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইব?"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "না, তাহা হইতে পারে না। ধনী লোকেরা যেরূপে জীবন ধারণ করে, তোমার জীবনও তদ্রূপ হইবে; কারণ, ধনের দ্বারা কখন অমৃতত্ব লাভ হয় না।"

---

* বৃহদারণ্যক উপনিষদের ২য় অধ্যায় ৪র্থ ব্রাহ্মণ ও ৪র্থ অধ্যায় ৫ম ব্রাহ্মণ দেখুন। এই অধ্যায়ের প্রায় সমুদয়ই ঐ দুই অংশের ভাবানুবাদ ও ব্যাখ্যামাত্র।

মৈত্রেয়ী কহিলেন, "যাহা দ্বারা আমি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহা লাভ করিবার জন্য আমাকে কি করিতে হইবে? যদি তাহা আপনার জানা থাকে, আমাকে তাহা বলুন।"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "তুমি বরাবরই আমার প্রিয়া ছিলে, এক্ষণে এই প্রশ্ন করাতে তুমি প্রিয়তরা হইলে। এস, আসন গ্রহণ কর, আমি তোমাকে তোমার জিজ্ঞাসিত তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিব। তুমি উহা শুনিয়া উহা ধ্যান করিতে থাক।"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেন,

"হে মৈত্রেয়ি, স্ত্রী যে স্বামীকে ভালবাসে, তাহা স্বামীর জন্য নহে, কিন্তু আত্মার জন্যই স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে; কারণ সে আত্মাকে ভালবাসিয়া থাকে। স্ত্রীকে স্ত্রীর জন্য কেহ ভালবাসে না, কিন্তু যেহেতু সে আত্মাকে ভালবাসে, সেই হেতু স্ত্রীকে ভালবাসিয়া থাকে। কেহই সন্তানগণকে তাহাদের জন্য ভালবাসে না, কিন্তু যেহেতু সে আত্মাকে ভালবাসে, সেই হেতুই সন্তানগণকে ভালবাসিয়া থাকে। কেহই অর্থকে অর্থের জন্য ভালবাসে না, কিন্তু যেহেতু লোকে আত্মাকে ভালবাসে, সেই হেতু অর্থ ভালবাসিয়া থাকে। ব্রাহ্মণকে যে লোকে ভালবাসে, তাহা সেই ব্রাহ্মণের জন্য নহে, কিন্তু আত্মাকে ভালবাসে বলিয়াই লোকে ব্রাহ্মণকে ভালবাসিয়া থাকে। ক্ষত্রিয়কেও লোকে ক্ষত্রিয়ের জন্য ভালবাসে না, আত্মাকে ভালবাসে বলিয়াই লোকে ক্ষত্রিয়কে ভালবাসিয়া থাকে। এই জগৎকেও লোকে যে ভালবাসে, তাহা জগতের জন্য নহে, কিন্তু যেহেতু সে আত্মাকে

ভালবাসে, সেই হেতু জগৎ তাহার প্রিয়। দেবগণকে যে লোকে ভালবাসে, তাহা সেই দেবগণের জন্য নহে, কিন্তু যেহেতু সে আত্মাকে ভালবাসে, সেই হেতু দেবগণ তাহার প্রিয়। অধিক কি, কোন বস্তুকে যে লোকে ভালবাসে, তাহা সেই বস্তুর জন্য নহে, কিন্তু তন্মধ্যে যে আত্মা বিদ্যমান তাহার জন্যই সে ঐ বস্তুকে ভালবাসে। অতএব এই আত্মার সম্বন্ধে শ্রবণ করিতে হইবে, তৎপরে মনন অর্থাৎ বিচার করিতে হইবে, তারপর নিদি-ধ্যাসন অর্থাৎ উহার ধ্যান করিতে হইবে। হে মৈত্রেয়ি, আত্মার শ্রবণ, আত্মার দর্শন, আত্মার সাক্ষাৎকার দ্বারা এই সমুদয় যাহা কিছু, সবই জ্ঞাত হয়।”

এই উপদেশের তাৎপর্য্য কি? এ এক অদ্ভুত রকমের দর্শন। আমরা জগৎ বলিতে যাহা কিছু বুঝি, সকলের ভিতর দিয়াই আত্মা প্রকাশ পাইতেছেন। লোকে বলিয়া থাকে, সর্ব্বপ্রকার প্রেমই স্বার্থপরতা—স্বার্থপরতার যতদূর নিম্নতম অর্থ হইতে পারে, সেই অর্থে সকল প্রেমই স্বার্থপরতাপ্রসূত; যেহেতু আমি আমাকে ভালবাসি, সেই হেতু অপরকে ভালবাসিয়া থাকি। বর্ত্তমান-কালেও অনেক দার্শনিক আছেন, যাঁহাদের মত এই যে, স্বার্থই জগতে সকল কার্য্যের একমাত্র প্রবৃত্তিদায়িনী শক্তি। একথা এক হিসাবে সত্য আবার অন্য হিসাবে ভুল। এই আমাদের ‘আমি’ সেই প্রকৃত ‘আমি’ বা আত্মার ছায়া মাত্র, যিনি আমা-দের পশ্চাতে রহিয়াছেন আর সসীম বলিয়াই এই ক্ষুদ্র ‘আমি’র উপর ভালবাসা অন্যায় ও মন্দ বলিয়া বোধ হয়। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড-

স্বরূপ আত্মার প্রতি যে ভালবাসা, তাহাকেই স্বার্থপরতা বলিয়া বোধ হয়, যেহেতু উহা সসীমভাবে দৃষ্ট হইতেছে। এমন কি, স্ত্রীও যখন স্বামীকে ভালবাসে, সে জানুক বা নাই জানুক, সে সেই আত্মার জন্যই স্বামীকে ভালবাসিতেছে। জগতে উহা স্বার্থ-পরতারূপে ব্যক্ত হইতেছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা আত্মপরতা বা আত্মপ্রীতির ক্ষুদ্র অংশমাত্র। যখনই কেহ কিছু ভালবাসে, তাহাকে সেই আত্মার মধ্য দিয়াই ভালবাসিতে হয়।

এই আত্মাকে জানিতে হইবে। যাহারা আত্মার স্বরূপ না জানিয়া উহাকে ভালবাসে, তাহাদের ভালবাসাই স্বার্থপরতা। যাহারা আত্মাকে জানিয়া উহাকে ভালবাসে, তাহাদের ভালবাসায় কোনরূপ বন্ধন নাই, তাহারা সাধু। কেহই ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণের জন্য ভালবাসে না কিন্তু ব্রাহ্মণের মধ্য দিয়া যে আত্মা প্রকাশ পাইতেছেন, সেই আত্মাকে ভালবাসে বলিয়াই সে ব্রাহ্মণকে ভালবাসে।

"ব্রাহ্মণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, যিনি ব্রাহ্মণকে আত্মা হইতে পৃথক্ দেখেন; ক্ষত্রিয় তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, যিনি ক্ষত্রিয়কে আত্মা হইতে পৃথক্ দেখেন; লোকসমূহ বা জগৎ তাঁহাকে ত্যাগ করে, যিনি জগৎকে আত্মা হইতে পৃথক্ দেখেন; দেবগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, যিনি দেবগণকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া বিশ্বাস করেন। সকল বস্তুই তাঁহাকে পরিত্যাগ করে, যিনি তাঁহাদিগকে আত্মা হইতে পৃথক্‌রূপে দর্শন করেন। এই ব্রাহ্মণ, এই ক্ষত্রিয়, এই লোকসমূহ, এই দেবগণ, এমন কি, যাহা কিছু জগতে আছে, সবই আত্মা।"

এইরূপে যাজ্ঞবল্ক্য ভালবাসা অর্থে তিনি কি লক্ষ্য করিতেছেন, তাহা বুঝাইলেন। যখনই আমরা এই প্রেমকে এক বিশেষ প্রদেশে সীমাবদ্ধ করি, তখনই যত গোলমাল। মনে করুন, আমি কোন স্ত্রীলোককে ভালবাসিতেছি, যদি আমি সেই স্ত্রীলোককে আত্মা হইতে পৃথক্ ভাবে, বিশেষ ভাবে দৃষ্টি করি, তবে উহা আর নিত্যস্থায়ী প্রেম হইল না। উহা স্বার্থপর ভালবাসা হইয়া পড়িল, আর দুঃখই উহার পরিণাম, কিন্তু যখনই আমি সেই স্ত্রীলোককে আত্মারূপে দেখিতে পারি, তখনই সেই ভালবাসা যথার্থ প্রেম হইল, তাহার কখন বিনাশ নাই। এইরূপ যখনই আপনারা সমগ্র জগৎ অর্থাৎ আত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া জগতের কোন এক বস্তুতে আসক্ত হন, তখনই তাহাতে প্রতিক্রিয়া আসিয়া থাকে। আত্মা ব্যতীত যাহা কিছু আমরা ভালবাসি, তাহারই ফল শোক ও দুঃখ। কিন্তু যদি আমরা সমুদয় বস্তুকে আত্মার অন্তর্গত ভাবিয়া ও আত্মাস্বরূপে সম্ভোগ করি, তাহা হইতে কোন কষ্ট বা প্রতিক্রিয়া আসিবে না। ইহাই পূর্ণ আনন্দ।

এই আদর্শে উপনীত হইবার উপায় কি? যাজ্ঞবল্ক্য ঐ অবস্থা লাভ করিবার প্রণালী বলিতেছেন। এই ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত; আত্মাকে না জানিয়া জগতের প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ বস্তু লইয়া উহাতে আত্মদৃষ্টি করিব কিরূপে?

"দূরে যদি একটী দুন্দুভি বাজিতে থাকে, আমরা উহা হইতে উৎপন্ন শব্দকে, শব্দতরঙ্গগুলিকে জয় করিয়া জয় করিতে পারি

না, কিন্তু যখনই আমরা দুন্দুভির নিকটে আসিয়া উহাকে গ্রহণ করি, তখনই ঐ শব্দও গৃহীত হয়।

"শঙ্খ বাজিতে থাকিলে যতক্ষণ না আমরা গিয়া ঐ শঙ্খটীকে গ্রহণ করি, ততক্ষণ শঙ্খ হইতে উৎপন্ন শব্দকে কখনই গ্রহণ করিতে পারি না।

"বীণা বাজিতে থাকিলে যেখান হইতে শব্দের উৎপত্তি হইতেছে, সেই বীণার নিকট আসিয়া উহাকে গ্রহণ করিতে পারিলেই শব্দোৎপত্তির কেন্দ্রকে আমরা জয় করিতে পারি।

"যেমন কেহ ভিজা কাঠ জ্বালাইতে থাকিলে তাহা হইতে নানা প্রকার ধূম ও স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তদ্রূপ সেই মহান্ পুরুষ হইতে ইতিহাস, নানাবিধ বিদ্যা প্রভৃতি, এমন কি, যাহা কিছু বস্তু সমুদয়ই নিঃশ্বাসের মত বহির্গত হইয়াছে। তাঁহার নিশ্বাস হইতে যেন সমুদয় জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে।

"যেমন সমুদয় জলের একমাত্র আশ্রয় সমুদ্র, যেমন সমুদয় স্পর্শের হস্তই এক কেন্দ্র, যেমন সমুদয় গন্ধের নাসিকাই এক কেন্দ্র, যেমন সমুদয় রসের জিহ্বাই এক কেন্দ্র, যেমন সমুদয় রূপের চক্ষুই এক কেন্দ্র, যেমন সমুদয় শব্দের কর্ণই এক কেন্দ্র, যেমন সমুদয় চিন্তার মনই এক কেন্দ্র, যেমন সমুদয় জ্ঞানের হৃদয়ই এক কেন্দ্র, যেমন সমুদয় কর্ম্মের হস্তই এক কেন্দ্র, যেমন সমুদয় বাক্যের বাগেন্দ্রিয়ই এক কেন্দ্র, যেমন সমুদ্রের জলের সর্ব্বাংশে জমাট লবণ রহিয়াছে, অথচ উহা চক্ষুতে দেখা যায় না, এইরূপ হে মৈত্রেয়ি, এই আত্মাকে চক্ষে দেখা যায় না,

কিন্তু তিনি এই জগতের সর্ব্বাংশ ব্যাপিয়া আছেন। তিনি সব। তিনি বিজ্ঞানঘনস্বরূপ। সমুদয় জগৎ তাঁহা হইতে উত্থিত হয় এবং পুনরায় তাঁহাতেই যায়। কারণ, তাঁহার নিকট পঁহুছিলে আমরা জ্ঞানাতীত অবস্থায় চলিয়া যাই।”

এখানে আমরা এই ভাব পাইলাম যে, আমরা সকলেই স্ফুলিঙ্গাকারে তাঁহা হইতে বহির্গত হইয়াছি আর তাঁহাকে জানিতে পারিলে তাঁহার নিকট ফিরিয়া গিয়া পুনরায় তাঁহার সহিত এক হইয়া যাই।

এই উপদেশে মৈত্রেয়ী ভীত হইলেন, যেমন সর্ব্বত্রই লোকে হইয়া থাকে।

মৈত্রেয়ী বলিলেন, “ভগবন্, আপনি এইখানে আমার মাথা গুলাইয়া দিলেন। দেবতা প্রভৃতি সে অবস্থায় থাকিবে না, ‘আমি’ জ্ঞান নষ্ট হইয়া যাইবে, ইহা বলিয়া আপনি আমার ভীতি উৎপাদন করিতেছেন। যখন আমি ঐ অবস্থায় পঁহুছিব, তখন কি আমি আত্মাকে জানিতে পারিব? আমি কি অহংজ্ঞান হারাইয়া অজ্ঞান অবস্থা প্রাপ্ত হইব, অথবা আমি তাঁহাকে জানিতেছি, এই জ্ঞান থাকিবে? তখন কি কাহাকেও জানিবার, কিছু অনুভব করিবার, কাহাকেও ভালবাসিবার, কাহাকেও ঘৃণা করিবার থাকিবে না?”

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, “মৈত্রেয়ি, মনে করিও না, আমি অজ্ঞান অবস্থার কথা বলিতেছি, ভয়ও পাইও না! এই আত্মা অবিনাশী, তিনি স্বরূপতঃ নিত্য। যে অবস্থায় দুই থাকে অর্থাৎ যাহা

দ্বৈতাবস্থা, তাহা নিম্নতর অবস্থা। যেখানে দ্বৈতভাব থাকে, সেখানে একজন অপরকে ঘ্রাণ করে, একজন অপরকে দর্শন করে, একজন অপরকে শ্রবণ করে, একজন অপরকে অভ্যর্থনা করে, একজন অপরের সম্বন্ধে চিন্তা করে, একজন অপরকে জানে। কিন্তু যখন সবই আত্মা হইয়া যায়, তখন কে কাহাকে ঘ্রাণ করিবে, কে কাহাকে দেখিবে, কে কাহাকে শুনিবে, কে কাহাকে অভ্যর্থনা করিবে, কে কাহাকে জানিবে? যাঁহা দ্বারা জানা যায়, তাঁহাকে কে জানিতে পারে? এই আত্মাকে কেবল নেতি নেতি (ইহা নহে, ইহা নহে) এইরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে। তিনি অচিন্ত্য, তাঁহাকে বুদ্ধি দ্বারা ধারণা করিতে পারা যায় না। তিনি অপরিণামী, তাঁহার কখন ক্ষয় হয় না। তিনি অনাসক্ত, কখনই প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত হন না। তিনি পূর্ণ, সমুদয় সুখদুঃখের অতীত। বিজ্ঞাতাকে কে জানিতে পারে? কি উপায়ে তাঁহাকে আমরা জানিতে পারি? কোন উপায়েই নহে। হে মৈত্রেয়ি, ইহাই ঋষিদিগের চরম সিদ্ধান্ত। সমুদয় জ্ঞানের অতীত অবস্থায় যাইলেই তাঁহাকে লাভ হয়। তখনই অমৃতত্ব লাভ হয়।”

এতদূর পর্য্যন্ত এই ভাব পাওয়া গেল যে, এই সমুদয়ই এক অনন্ত পুরুষ আর তাঁহাতেই আমাদের যথার্থ আমিত্ব—সেখানে কোন ভাগ বা অংশ নাই, সকল ভ্রমাত্মক নিম্নভাব কিছুই নাই। কিন্তু তথাপি এই ক্ষুদ্র আমিত্বের ভিতর আগাগোড়া সেই অনন্ত যথার্থ আমিত্ব প্রতিভাত হইতেছে। সমুদয়ই আত্মার অভিব্যক্তি-মাত্র। কি করিয়া আমরা এই আত্মাকে লাভ করিব? যাজ্ঞবল্ক্য

প্রথমেই আমাদিগকে বলিয়াছেন, 'প্রথমে এই আত্মার সম্বন্ধে শুনিতে হইবে, তার পর বিচার করিতে হইবে, তৎপরে উহার ধ্যান করিতে হইবে।' ঐ পর্য্যন্ত তিনি আত্মাকে এই জগতের সর্ব্ববস্তুর সাররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তার পর সেই আত্মার অনন্ত স্বরূপ আর মানবমনের সান্তভাবের সম্বন্ধে বিচার করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, সকলের জ্ঞাতা আত্মাকে সীমাবদ্ধ মনের দ্বারা জানা অসম্ভব। তবে যদি আত্মাকে জানিতে পারা যায় না, তবে কি করিতে হইবে? যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিলেন, যদিও আত্মাকে জানা যায় না, তথাপি উহাকে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। সুতরাং তাঁহাকে কিরূপে ধ্যান করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। এই জগৎ সকল প্রাণীরই কল্যাণকারী এবং প্রত্যেক প্রাণীই জগতের কল্যাণকারী; কারণ, উভয়েই পরস্পরের অংশীভূত—একের উন্নতি অপরের উন্নতির সাহায্য করে। কিন্তু স্বপ্রকাশ আত্মার কল্যাণকারী বা সাহায্যকারী কেহ হইতে পারে না, কারণ, তিনি পূর্ণ ও অনন্তস্বরূপ। জগতে যত কিছু আনন্দ আছে, এমন কি, খুব নিম্নদরের আনন্দ পর্য্যন্ত ইহারই প্রতিবিম্বমাত্র। যাহা কিছু ভাল, সবই সেই আত্মার প্রতিবিম্বমাত্র, আর ঐ প্রতিবিম্ব যখন অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট হয়, তাহাকেই মন্দ বলা যায়। যখন এই আত্মা কম অভিব্যক্ত, তখন তাহাকে তমঃ বা মন্দ বলে; যখন অধিকতর অভিব্যক্ত, তখন উহাকে প্রকাশ বা ভাল বলে। এই মাত্র প্রভেদ। ভাল মন্দ কেবল মাত্রার তারতম্য, আত্মার কম

বেশী অভিব্যক্তি লইয়া। আমাদের নিজেদের জীবনের দৃষ্টান্তই লউন। ছেলেবেলা কত জিনিষকে আমরা ভাল বলিয়া মনে করি, বাস্তবিক সেগুলি মন্দ আবার কত জিনিষকে মন্দ বলিয়া দেখি, বাস্তবিক সেগুলি ভাল। আমাদের ধারণার কেমন পরিবর্ত্তন হয়। একটা ভাব কেমন উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে থাকে। আমরা এক সময়ে যাহা খুব ভাল বলিয়া ভাবিতাম, এখন আর তাহা তদ্রূপ ভাল ভাবি না। এইরূপে ভাল মন্দ আমাদের মনের বিকাশের উপর নির্ভর করে, বাহিরে উহাদের অস্তিত্ব নাই। প্রভেদ কেবল মাত্রার তারতম্যে। সবই সেই আত্মারই প্রকাশমাত্র। উহা সকলেতেই প্রকাশ পাইতেছে, কেবল উহার প্রকাশ অল্প হইলে আমরা উহাকে মন্দ বলি ও স্পষ্টতর হইলে ভাল বলি। কিন্তু আত্মা স্বয়ং শুভাশুভের অতীত। অতএব জগতে যাহা কিছু আছে, সকলকেই প্রথমে ভাল বলিয়া ধ্যান করিতে হইবে, কারণ, উহারা সেই পূর্ণস্বরূপের অভিব্যক্তি। তিনি ভালও নন, মন্দও নন; তিনি পূর্ণ আর পূর্ণ বস্তু কেবল একটীই হইতে পারে। ভাল জিনিষ অনেক প্রকার হইতে পারে, মন্দও অনেক থাকিতে পারে, ভালমন্দের মধ্যে প্রভেদের নানাবিধ মাত্রা থাকিতে পারে, কিন্তু পূর্ণ বস্তু কেবল একমাত্র; ঐ পূর্ণ বস্তু বিশেষ বিশেষ প্রকার আবরণের মধ্য দিয়া দৃষ্ট হইলে বিভিন্ন মাত্রায় ভাল বলিয়া আমরা অভিহিত করি, অন্য প্রকার আবরণের মধ্য দিয়া উহা প্রকাশিত হইলে উহাকে আমরা মন্দ বলিয়া অভিহিত করি। এই বস্তু সম্পূর্ণ ভাল ও এই বস্তু সম্পূর্ণ মন্দ

—এরূপ ধারণা কুসংস্কারমাত্র। প্রকৃত পক্ষে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, এই জিনিষ বেশী ভাল ও এই জিনিষ কম ভাল আর কম ভালকেই আমরা মন্দ বলি। ভাল মন্দ সম্বন্ধে এই সমুদয় ভ্রান্ত ধারণাই সর্ব্বপ্রকার দ্বৈত ভ্রম প্রসব করিয়াছে। উহারা সকল যুগের নরনারার বিভীষিকাপ্রদ ভাবরূপে মানবজাতির হৃদয়ে দৃঢ়-নিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমরা যে অপরকে ঘৃণা করি, তাহার কারণ শৈশবকাল হইতে অভ্যস্ত এই সকল নির্ব্বোধজনোচিত ধারণা। মানবজাতিসম্বন্ধে আমাদের বিচার সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্তিপূর্ণ হইয়াছে, আমরা এই সুন্দর পৃথিবীকে নরকে পরিণত করিয়াছি, কিন্তু যখনই আমরা ভালমন্দর এই ভ্রান্ত ধারণাগুলিকে ছাড়িয়া দিব, তখনই ইহা স্বর্গে পরিণত হইবে।

এখন যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার স্ত্রীকে কি উপদেশ করিতেছেন, শুনা যাউক।

"এই পৃথিবী সকল প্রাণীর পক্ষে মধু অর্থাৎ মিষ্ট বা আনন্দ-জনক, সকল প্রাণীই আবার এই পৃথিবীর পক্ষে মধু—উভয়েই পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া থাকে। আর ইহাদের এই মধুরত্ব সেই তেজোময় অমৃতময় আত্মা হইতে আসিতেছে।"

সেই এক মধু বা মধুরত্ব বিভিন্ন ভাবে অভিব্যক্ত হইতেছে। যেখানেই মানবজাতির ভিতর কোনরূপ প্রেম বা মধুরত্ব দেখা যায়, সাধুতেই হউক, পাপীতেই হউক, মহাপুরুষেই হউক বা হত্যাকারীতেই হউক, দেহে হউক, মনে হউক বা ইন্দ্রিয়েই হউক, সেখানেই তিনি রহিয়াছেন। সেই এক পুরুষ ব্যতীত উহা আর

কি হইতে পারে? অতি নীচতম ইন্দ্রিয়সুখও তিনি, আবার উচ্চতম আধ্যাত্মিক আনন্দও তিনি। তিনি ব্যতীত মধুরত্ব কিছুর থাকিতে পারে না। যাজ্ঞবল্ক্য ইহাই বলিতেছেন। যখন আপনি ঐ অবস্থায় উপনীত হইবেন, যখন সকল বস্তু সমদৃষ্টিতে দেখিবেন, যখন মাতালের পানাসক্তি ও সাধুর ধ্যানে সেই এক মধুরত্ব, এক আনন্দের প্রকাশ দেখিবেন, তখনই বুঝিতে হইবে, আপনি সত্য পাইয়াছেন। তখনই কেবল আপনি বুঝিবেন, সুখ কাহাকে বলে, শান্তি কাহাকে বলে, প্রেম কাহাকে বলে। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত আপনি এই বৃথা ভেদজ্ঞান রাখিবেন, আহাম্মকের মত ছেলেমানুষী কুসংস্কারগুলি রাখিবেন, ততদিন আপনার সর্ব্ব-প্রকার দুঃখ আসিবে। সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষই সমগ্র জগতের ভিত্তিস্বরূপ উহার পশ্চাতে রহিয়াছেন—সমুদয়ই তাঁহার মধুরত্বের অভিব্যক্তি মাত্র। এই দেহটীও যেন ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ—আর এই দেহের সমুদয় শক্তিগুলির ভিতর দিয়া, মনের সর্ব্ব-প্রকার উপভোগের মধ্য দিয়া সেই তেজোময় পুরুষ প্রকাশ পাইতেছেন। দেহের মধ্যে সেই যে তেজোময় স্বপ্রকাশ পুরুষ রহিয়াছেন, তিনিই আত্মা। "এই জগৎ সকল প্রাণীর পক্ষে এমন মধুময় এবং সকল প্রাণীই উহার নিকট মধুময়"; কারণ, সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এই সমগ্র জগতের আনন্দস্বরূপ। আমাদের মধ্যেও তিনি আনন্দস্বরূপ। তিনিই ব্রহ্ম।

"এই বায়ু সকল প্রাণীর পক্ষে মধুস্বরূপ আর এই বায়ুর নিকটও সকল প্রাণী মধুস্বরূপ; কারণ, সেই তেজোময় অমৃতময়

পুরুষ বায়ুতেও রহিয়াছেন এবং দেহেও রহিয়াছেন। তিনি সকল প্রাণীর প্রাণরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।”

“এই সূর্য্য সকল প্রাণীর পক্ষে মধুস্বরূপ এবং এই সূর্য্যের পক্ষেও সকল প্রাণী মধুস্বরূপ। কারণ, সেই তেজোময় পুরুষ সূর্য্যে রহিয়াছেন এবং তাঁহারই প্রতিবিম্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিরূপে প্রকাশ পাইতেছে। সমুদয়ই তাঁহার প্রতিবিম্ব ব্যতীত আর কি হইতে পারে? তিনি আমাদের দেহেও রহিয়াছেন এবং তাঁহারই ঐ প্রতিবিম্ববলে আমরা আলোকদর্শনে সমর্থ হইতেছি।”

“এই চন্দ্র সকল প্রাণীর পক্ষে মধুস্বরূপ, এই চন্দ্রের পক্ষে আবার সকল প্রাণী মধুস্বরূপ; কারণ, সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, যিনি চন্দ্রের অন্তরাত্মাস্বরূপ, তিনিই আমাদের ভিতর মনরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।”

“এই বিদ্যুৎ সকল প্রাণীর পক্ষে মধুস্বরূপ, সকল প্রাণীই বিদ্যুতের পক্ষে মধুস্বরূপ। কারণ, সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ বিদ্যুতের আত্মাস্বরূপ আর তিনি আমাদের মধ্যেও রহিয়াছেন, কারণ, সবই সেই ব্রহ্ম।”

“সেই ব্রহ্ম, সেই আত্মা, সকল প্রাণীর রাজা।”

এই ভাবগুলি মানবের পক্ষে বড়ই উপকারী; ঐগুলি ধ্যানের জন্য উপদিষ্ট। দৃষ্টান্তস্বরূপ—পৃথিবীকে ধ্যান করিতে থাকুন, পৃথিবীকে চিন্তা করুন, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ভাবুন যে, পৃথিবীতে যাহা আছে, আমাদের দেহেও তাহাই আছে। চিন্তাবলে পৃথিবী ও দেহে এক করিয়া ফেলুন আর দেহস্থ আত্মার সহিত পৃথিবীর

অভ্যন্তরবর্ত্তী আত্মার অভিন্নভাব সাধন করুন। বায়ুকে বায়ুর অভ্যন্তরবর্ত্তী ও আপনার অভ্যন্তরবর্ত্তী আত্মার সহিত অভিন্নভাবে চিন্তা করুন। এইরূপে এই সকল ধ্যান করিতে হয়। এই সবই এক, বিভিন্নাকারে প্রকাশ পাইতেছে মাত্র। সকল ধ্যানেরই চরম লক্ষ্য—এই একত্ব উপলব্ধি করা আর যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

জ্ঞানযোগের চরমাদর্শ।

অদ্যকার বক্তৃতা হইয়াই এই সাংখ্য ও বেদান্ত বিষয়ক বক্তৃতাবলি সমাপ্ত হইবে, অতএব আমি এই কয়দিন ধরিয়া যাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম, অদ্য সংক্ষেপে তাহার পুনরাবৃত্তি করিব। বেদ ও উপনিষদে আমরা হিন্দুদের অতি প্রাচীনতম ধর্ম্মভাবের কয়েকটীর বর্ণনা পাইয়া থাকি। আর মহর্ষি কপিল খুব প্রাচীন বটে, কিন্তু এই সকল ভাব তাঁহা হইতেও প্রাচীনতর। কপিলের সাংখ্যদর্শন তদুদ্ভাবিত নূতন মতবাদবিশেষ নহে। তাঁহার সময়ে ধর্ম্মসম্বন্ধে যে সকল বিভিন্নমতবাদরাশি প্রচলিত ছিল, তিনি নিজের অপূর্ব্বপ্রতিভাবলে তাহা হইতে একটী যুক্তি-সঙ্গত ও সামঞ্জস্যময় প্রণালী গঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। তিনি ভারতবাসিগণের নিকট যে মনোবিজ্ঞান প্রচারে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা এখনও হিন্দুদিগের মধ্যে বিভিন্ন আপাতবিরোধী দার্শনিকসম্প্রদায়সমূহ মানিয়া থাকে। পরবর্ত্তী কোন দার্শনিকই এ পর্য্যন্ত তাঁহার মানবমনের অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ এবং জ্ঞানলাভপ্রক্রিয়াসম্বন্ধে বিস্তারিত সিদ্ধান্তের উপরে যাইতে পারেন নাই, আর তিনি নিঃসন্দেহ অদ্বৈতবাদের ভিত্তিস্থাপন করিয়া যান—উহা—তিনি যতদূর পর্য্যন্ত সিদ্ধান্তে অগ্রসর হইয়া-

ছিলেন—তাহা গ্রহণ করিয়া আর এক পদ অগ্রসর হইল। এই-রূপে সাংখ্যদর্শনের শেষ সিদ্ধান্ত দ্বৈতবাদ ছাড়াইয়া চরম একত্বে পঁহুছিল।

কপিলের সময়ের পূর্ব্বে ভারতে যে সকল ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচলিত ছিল (আমি অবশ্য পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ধর্ম্মতত্ত্বগুলিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি, ধর্ম্মনামের অযোগ্য খুব নিম্ন ধারণাগুলি নহে) তাহাদের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, তন্মধ্যে প্রাথমিক শ্রেণী-গুলির ভিতরও প্রত্যাদেশ, ঈশ্বরাদিষ্ট শাস্ত্র প্রভৃতি ধারণা ছিল। অতি প্রাচীনতম অবস্থায় সৃষ্টির ধারণা বড়ই বিচিত্র—তাহা এই যে, সমগ্র জগৎ ঈশ্বরেচ্ছায় শূন্য হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, আদিতে এই জগৎ একেবারে ছিল না, আর সেই অভাব বা শূন্য হইতেই এই সমুদয় আসিয়াছে। পরবর্ত্তী সোপানে আমরা দেখিতে পাই, এই সিদ্ধান্তে সন্দেহ প্রকাশ করা হইতেছে। বেদান্তের প্রথম সোপানেই এই প্রশ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি কিরূপে হইতে পারে? যদি এই জগৎ সৎ অর্থাৎ অস্তিত্বযুক্ত হয়, তবে ইহা অবশ্য কিছু হইতে আসিয়াছে। এই প্রাচীনেরা সহজেই দেখিতে পাইলেন, কোথাও এমন কিছুই নাই, যাহা 'কিছু না' হইতে উৎপন্ন হইতেছে। মনুষ্যহস্তের দ্বারা যাহা কিছু কার্য্য হয়, তাহাতেই ত উপাদানকারণের প্রয়োজন হয়। অতএব প্রাচীন হিন্দুরা স্বভাবতঃই, এই জগৎ যে শূন্য হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, এই প্রথম ধারণা ত্যাগ করিলেন আর এই জগৎসৃষ্টির কারণীভূত উপাদান কি, তাহার অন্বেষণে

প্রবৃত্ত হইলেন। বাস্তবিক পক্ষে সমগ্র জগতের ধর্ম্মেতিহাস—কোথা হইতে এই সমুদয়ের উৎপত্তি হইল, এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টায় এই উপাদানকারণের অন্বেষণ মাত্র। নিমিত্ত-কারণ বা ঈশ্বরের বিষয় ব্যতীত, ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন কি না, এই প্রশ্ন ব্যতীত,—চিরকালই এই মহাপ্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে—ঈশ্বর কি উপাদান লইয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরের উপরেই বিভিন্ন দর্শন নির্ভর করিতেছে।

একটী সিদ্ধান্ত এই যে, এই উপাদান এবং ঈশ্বর ও আত্মা তিনই নিত্য বস্তু—উহারা যেন তিনটী সমান্তরাল রেখার মত অনন্তকালের জন্য পাশাপাশি চলিয়াছে—উহাদের মধ্যে প্রকৃতি ও আত্মাকে তাঁহারা অস্বতন্ত্র তত্ত্ব এবং ঈশ্বরকে স্বতন্ত্র তত্ত্ব বা পুরুষ বলেন। প্রত্যেক জড়পরমাণুর ন্যায় প্রত্যেক আত্মাই ঈশ্বরেচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন। যখন কপিল সাংখ্য মনোবিজ্ঞান প্রচার করিলেন, তখন পূর্ব্ব হইতেই এই সকল ও অন্যান্য অনেক প্রকার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ধারণা বিদ্যমান ছিল। ঐ মনোবিজ্ঞানের মতে বিষয়ানুভূতির প্রণালী এই—প্রথমতঃ, বাহিরের বস্তু হইতে ঘাত বা ইঙ্গিত প্রদত্ত হয়, তাহাতে ইন্দ্রিয়-সমূহের ভৌতিক দ্বার-সকলকে উত্তেজিত করে। যেমন প্রথমে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারে বাহ্য বিষয়ের আঘাত লাগিল, চক্ষুরাদি দ্বার বা যন্ত্র হইতে তত্তদিন্দ্রিয়ে, ইন্দ্রিয়-সমূহ হইতে মনে, মন হইতে বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধি হইতে এমন এক পদার্থে গিয়া লাগিল—যাহা এক তত্ত্ব-

স্বরূপ—উহাকে তাঁহারা আত্মা বলেন। আধুনিক শারীরবিধান শাস্ত্র আলোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার বিষয়ানুভূতির জন্য বিভিন্ন কেন্দ্র আছে, ইহা আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রথমতঃ, নিম্নশ্রেণীর কেন্দ্রসমূহ, দ্বিতীয়তঃ, উচ্চ শ্রেণীর কেন্দ্রসমূহ আর এই দুইটীর সঙ্গে মন ও বুদ্ধির কার্য্যের সহিত ঠিক মিলে, কিন্তু তাঁহারা এমন কোন কেন্দ্র পান নাই, যাহা অপর সমুদয় কেন্দ্রগুলিকে নিয়মিত করিতেছে, সুতরাং কে এই সমুদয় কেন্দ্রগুলির একত্ব বিধান করিতেছে, শারীরবিধান শাস্ত্র তাহার উত্তর দিতে অক্ষম। কোথায় এবং কিরূপে এই কেন্দ্রগুলি মিলিত হয়? মস্তিষ্ককেন্দ্রসমূহ সকলেই পৃথক্ পৃথক্, আর এমন কোন একটী কেন্দ্র নাই, যাহা অপর সকল কেন্দ্রগুলিকে নিয়মিত করিতেছে। অতএব এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে সাংখ্য মনোবিজ্ঞানের প্রতিবাদী কেহ নাই। একটা সম্পূর্ণ বস্তু গঠনের জন্য এই একীভাব, যাহার উপর বিষয়ানুভূতিগুলি প্রতিবিম্বিত হইবে, এমন কিছু প্রয়োজন। সেই কিছু না থাকিলে আমি আপনার বা ঐ ছবিখানার বা অন্য কোন বস্তুরই কোন জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। যদি আমাদের ভিতরে এই একত্ববিধায়ক কিছু না থাকিত, তবে আমরা হয়ত কেবল দেখিতেই লাগিলাম, খানিক পরে শুনিতে লাগিলাম, খানিক পরে স্পর্শানুভব করিতে লাগিলাম আর এমন হইত যে, একজন কথা কহিতেছে শুনিতেছি, কিন্তু তাহাকে মোটেই দেখিতে পাইতেছি না, কারণ, কেন্দ্রসমূহ ভিন্ন ভিন্ন।

এই দেহ জড়পরমাণুবিরচিত আর ইহা জড় ও অচেতন। যাহাকে সূক্ষ্মশরীর বলা হয়, তাহাও তদ্রূপ। সাংখ্যের মতে সূক্ষ্মশরীর অতি সূক্ষ্ম পরমাণুগঠিত একটী ক্ষুদ্র শরীর—উহার পরমাণুগুলি এত সূক্ষ্ম যে, কোন প্রকার অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারাই উহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সূক্ষ্মদেহের প্রয়োজন কি? উহা, আমরা যাহাকে মন বলি, তাহার আধারস্বরূপ। যেমন এই স্থূল শরীর স্থূলতর শক্তিসমূহের আধার, তদ্রূপ সূক্ষ্ম শরীর, চিন্তা ও উহার নানাবিধ বিকারস্বরূপ সূক্ষ্মতর শক্তি-সমূহের আধার। প্রথমতঃ, এই স্থূল শরীর—ইহা স্থূল জড় ও স্থূল শক্তি ময়। শক্তি জড় ব্যতীত থাকিতে পারে না, কারণ, উহা কেবল জড়ের মধ্য দিয়াই আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে। অতএব স্থূলতর শক্তিসমূহ এই স্থূল শরীরের মধ্য দিয়াই কার্য্য করিতে পারে ও অবশেষে উহারা সূক্ষ্মতর রূপ ধারণ করে। যে শক্তি স্থূলভাবে কার্য্য করিতেছে, তাহাই সূক্ষ্মতররূপে কার্য্য করিতে থাকে ও চিন্তারূপে পরিণত হয়। উহাদের মধ্যে কোন-রূপ বাস্তব ভেদ নাই, একই বস্তুর একটী স্থূল ও অপরটী সূক্ষ্ম প্রকাশ মাত্র। সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূল শরীরের মধ্যেও উপাদানগত কোন ভেদ নাই। সূক্ষ্ম শরীরও জড়, তবে উহা খুব সূক্ষ্ম জড়।

এই সকল শক্তি কোথা হইতে আইসে? বেদান্ত দর্শনের মতে প্রকৃতি দুইটী বস্তুতে গঠিত—একটীকে তাঁহারা আকাশ বলেন, উহা অতি সূক্ষ্ম জড় আর অপরটীকে তাঁহারা প্রাণ বলেন। আপনারা পৃথিবী, বায়ু বা অন্য যাহা কিছু দেখেন, শুনেন বা

স্পর্শ দ্বারা অনুভব করেন, তাহাই জড় আর সকলই এই আকাশেরই বিভিন্নরূপ মাত্র। উহা প্রাণ বা সর্ব্বব্যাপী শক্তির প্রেরণায় কখন সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হয়, কখন স্থূল হইতে স্থূলতর হয়। আকাশের ন্যায় প্রাণও সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্ববস্তুতে অনুস্যূত। আকাশ যেন জলের মত আর জগতে আর যাহা কিছু আছে, সমুদয়ই বরফখণ্ডের ন্যায় ঐগুলি হইতে উৎপন্ন হইয়া জলেই ভাসিতেছে আর প্রাণই সেই শক্তি, যাহা আকাশকে এই বিভিন্নরূপে পরিণত করিতেছে।

এই দেহযন্ত্র—পৈশিকগতি, অর্থাৎ ভ্রমণ, উপবেশন, বাক্যকথন প্রভৃতিরূপে প্রাণের স্থূলাকারে প্রকাশের জন্য আকাশ হইতে নির্ম্মিত হইয়াছে। সূক্ষ্ম শরীরও সেই প্রাণের চিন্তারূপ সূক্ষ্ম আকারে অভিব্যক্তির জন্য আকাশ হইতে—আকাশের সূক্ষ্মতর রূপ হইতে—নির্ম্মিত হইয়াছে। অতএব, প্রথমে এই স্থূল শরীর, তারপর সূক্ষ্ম শরীর, তারপর জীব বা আত্মা—উহাই মানবের যথার্থ স্বরূপ। যেমন আমাদের নখ বৎসরে শতবার কাটিয়া ফেলা যাইতে পারে, কিন্তু উহা আমাদের শরীরেরই অংশস্বরূপ, উহা হইতে পৃথক্ নহে, তেমনি আমাদের শরীর দুটী নহে। মানুষের একটী সূক্ষ্ম শরীর আর একটি স্থূল শরীর আছে, তাহা নহে; শরীর একই, তবে সূক্ষ্মাকারে উহা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল থাকে, আর স্থূলটী শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। যেমন আমি বৎসরে শতবার এই নখ কাটিয়া ফেলিতে পারি; তদ্রূপ এক যুগে আমি লক্ষ লক্ষ স্থূল শরীর ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু

সূক্ষ্ম শরীর থাকিয়া যাইবে। দ্বৈতবাদীদের মতে এই জীব অর্থাৎ মানুষের যথার্থ স্বরূপ যাহা, তাহা অণু অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম।

এতদূর পর্য্যন্ত আমরা দেখিলাম, মানুষের আছে প্রথমতঃ এই স্থূল শরীর, যাহা অতি শীঘ্রই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তারপর সূক্ষ্ম শরীর—উহা যুগযুগান্তর ধরিয়া বর্ত্তমান থাকে, তারপর জীবাত্মা। বেদান্ত দর্শনের মতে ঈশ্বর যেমন নিত্য, এই জীবও তদ্রূপ নিত্য, আর প্রকৃতিও নিত্য—তবে উহা প্রবাহরূপে নিত্য। প্রকৃতির উপাদানস্বরূপ আকাশ ও প্রাণ নিত্য, কিন্তু অনন্তকাল ধরিয়া উহারা বিভিন্নাকারে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। জড় ও শক্তি নিত্য, কিন্তু উহাদের সমবায়সমূহ সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল। জীব আকাশ বা প্রাণ কিছু হইতেই নির্ম্মিত নহে, উহা অজড়, অতএব চিরকাল ধরিয়া উহা থাকিবে। উহা প্রাণ ও আকাশের কোনরূপ সংযোগের ফলস্বরূপ নহে, আর যাহা সংযোগের ফল নহে, তাহা কখন নষ্ট হইবে না; কারণ, বিনাশের অর্থ সংযোগের বিশ্লেষণ। যে কোন বস্তু যৌগিক নহে, তাহা কখন নষ্ট হইতে পারে না। স্থূল-শরীর আকাশ ও প্রাণের নানারূপে সংযোগের ফল, সুতরাং উহা বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইবে। সূক্ষ্ম শরীরও দীর্ঘকাল পরে বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইবে, কিন্তু জীব অযৌগিক পদার্থ, সুতরাং উহা কখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে না। পূর্ব্বোক্ত কারণেই আমরা বলিতে পারি না যে, জীবের কোনকালে জন্ম হইয়াছে। কোন অযৌগিক পদার্থের জন্ম হইতে পারে না; কেবল যাহা যৌগিক, তাহারই জন্ম হইতে পারে।

লক্ষ লক্ষ প্রকার আকারে মিশ্রিত এই সমগ্র প্রকৃতি ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ ও নিরাকার এবং তিনি দিবারাত্র এই প্রকৃতিকে পরিচালিত করিতেছেন। সমগ্র প্রকৃতিই তাঁহার শাসনাধীনে রহিয়াছে। কোন প্রাণীর স্বাধীনতা নাই, উহা থাকিতেই পারে না। তিনিই শাস্তা। ইহাই দ্বৈতবাদাত্মক বেদান্তের উপদেশ।

তারপর এই প্রশ্ন আসিতেছে যে, যদি ঈশ্বর এই জগতের শাস্তা হন, তবে তিনি কেন এমন কুৎসিৎ জগৎ সৃষ্টি করিলেন? কেন আমরা এত কষ্ট পাইব? ইহার উত্তর এইরূপ দেওয়া হইয়া থাকে যে, ইহাতে ঈশ্বরের কোন দোষ নাই। আমাদের নিজেদের দোষেই আমরা কষ্ট পাইয়া থাকি। আমরা যেরূপ বীজ বপন করি, তদ্রূপ শস্যই পাইয়া থাকি। ঈশ্বর আমাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য কিছু করেন না। যদি কোন ব্যক্তি দরিদ্র, অন্ধ বা খঞ্জ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, বুঝিতে হইবে, সে ঐরূপে জন্মিবার পূর্ব্বে এমন কিছু করিয়াছিল, যাহা এই ফল প্রসব করিয়াছে। জীব চিরকাল হইতে বর্ত্তমান আছেন, তিনি কখন সৃষ্ট হন নাই। আর তিনি চিরকাল ধরিয়া নানারূপ কার্য্য করিতেছেন। আর আমরা যাহা কিছু করি, তাহারই ফলভোগ করিতে হয়। যদি শুভকর্ম্ম করি, তবে আমরা সুখলাভ করিব, অশুভ কর্ম্ম করিলে দুঃখভোগ করিতে হইবে। জীব স্বরূপতঃ শুদ্ধস্বভাব, তবে দ্বৈতবাদী বলেন, অজ্ঞান উহার স্বরূপকে আবৃত করিয়াছে। যেমন অসৎ কর্ম্মের দ্বারা উহা আপনাকে

অজ্ঞানে আবৃত করিয়াছে, তদ্রূপ শুভকর্ম্মের দ্বারা উহা নিজস্বরূপ পুনরায় জানিতে পারে। জীব যেমন নিত্য, তদ্রূপ শুদ্ধ। প্রত্যেক ব্যক্তির স্বরূপ শুদ্ধ। যখন শুভকর্ম্মের দ্বারা উহার সমুদয় পাপ ও অশুভ কর্ম্ম ধৌত হইয়া যায়, তখন জীব আবার শুদ্ধ হয় আর যখন সে শুদ্ধ হয়, তখন সে মৃত্যুর পর দেবযান পথে স্বর্গে বা দেবলোকে গমন করে। যদি সে অমনি চলন-সইগোছের ভাল লোক হয়, সে পিতৃলোকে গমন করে।

স্থূলদেহের পতন হইলে বাক্যেন্দ্রিয় মনে প্রবেশ করে। বাক্য ব্যতীত চিন্তা করিতে পারা যায় না; যেখানেই বাক্য, তথায়ই অবশ্যই চিন্তা বিদ্যমান। মন আবার প্রাণে লয় হয়, প্রাণ জীবে লয় প্রাপ্ত হয়। তখন জীব দেহ ত্যাগ করিয়া তাহার ভূত জীবনের কর্ম্মের ফলস্বরূপ যে পুরস্কার বা শাস্তির উপযুক্ত, তদবস্থায় গমন করে। দেবলোক অর্থে দেবগণের বাসস্থান। দেব শব্দের অর্থ উজ্জ্বল বা প্রকাশস্বভাব—খৃষ্টীয়ান্ ও মুসলমানেরা যাহাকে Angel বলেন, দেব বলিতে তাহাই বুঝায়। ইঁহাদের মতে—দান্তে তাঁহার Divine Comedyতে যেরূপ নানাবিধ স্বর্গলোকের বর্ণনা করিয়াছেন কতকটা তাহারই মত—নানা প্রকার স্বর্গলোক আছে। যথা—পিতৃলোক, দেবলোক, চন্দ্রলোক, বিদ্যুল্লোক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মলোক—ব্রহ্মার স্থান। ব্রহ্মলোক ব্যতীত অন্যান্য স্থান হইতে জীব ইহলোকে ফিরিয়া আসিয়া আবার নরজন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু যিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তিনি তথায় অনন্তকাল ধরিয়া বাস করেন। যে সকল

শ্রেষ্ঠতম মানব সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও সম্পূর্ণ পবিত্র হইয়াছেন, যাঁহারা সমুদয় বাসনা ত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা ও তদীয় প্রেমে নিমগ্ন হওয়া ব্যতীত আর কিছু করিতে চান না, তাঁহাদেরই এইরূপ শ্রেষ্ঠতম গতি হয়। ইঁহাদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ নিম্নদরের দ্বিতীয় শ্রেণীর আর একদল লোক আছেন, তাঁহারা শুভকর্ম্ম করেন বটে, কিন্তু তজ্জন্য পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা ঐ শুভকর্ম্মের ফলস্বরূপ স্বর্গে যাইতে চাহেন। তাঁহাদের মৃত্যুর পর তাঁহাদের জীব চন্দ্রলোকে গিয়া স্বর্গসুখ ভোগ করিতে থাকেন। তথায় তিনি একজন দেব হন। দেবগণ অমর নহেন, তাঁহাদিগকেও মরিতে হয়। স্বর্গেও সকলে মরিবে। মৃত্যুশূন্য স্থান কেবল ব্রহ্মলোক, সেখানেই কেবল জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। আমাদের পুরাণে দৈত্যদিগেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা সময়ে সময়ে দেবগণের সহিত বিরোধ করেন। সর্ব্বদেশের পুরাণেই এই দেবদৈত্যের সংগ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। সময়ে সময়ে দৈত্যেরা দেবগণের উপর জয়লাভ করিয়া থাকেন। সকল দেশের পুরাণে ইহাও পাওয়া যায় যে, দেবগণ মানবজাতির সুন্দরী দুহিতাপ্রিয়। দেবরূপে জীব কেবল তাঁহার ভূতকর্ম্মের ফলভোগ করেন, কিন্তু কোন নূতন কর্ম্ম করেন না। কর্ম্ম অর্থে যে সকল কার্য্য ফলপ্রসব করিবে, সেগুলিও বুঝাইয়া থাকে আবার ফলগুলিকেও বুঝাইয়া থাকে। মানুষের যখন মৃত্যু হয় ও সে দেব হয়, তখন সে কেবল সুখভোগ করে, নূতন কোন কর্ম্ম করে না। সে তাহার অতীত শুভকর্ম্মের পুরস্কার ভোগ করে মাত্র। কিন্তু

যখন ঐ শুভকর্ম্মের ফল শেষ হইয়া যায়, তখন তাহার অন্য কর্ম্মফল প্রসবোন্মুখ হয়।

বেদে নরকের কোন প্রসঙ্গ নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে পুরাণকার—আমাদের পরবর্ত্তী কালের শাস্ত্রকারগণ—ভাবিয়াছিলেন, নরক না থাকিলে কোন ধর্ম্মই সম্পূর্ণ হইতে পারে না, সুতরাং তাঁহারা নানাবিধ নরক কল্পনা করিলেন। দান্তে তাঁহার 'নরকে' যত প্রকারের শাস্তি দেখিয়াছিলেন, ইঁহারা তত প্রকার, এমন কি, তাহা হইতেও অধিক প্রকার নরক যন্ত্রণার কল্পনা করিলেন। তবে আমাদের শাস্ত্র দয়া করিয়া বলেন, এই শাস্তি কিছুকালের জন্য মাত্র। ঐ অবস্থায় অশুভ কর্ম্মের ফল ভোগ হইয়া উহা ক্ষয় হইয়া যায়, তখন জীবাত্মাগণ পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া আর একবার উন্নতি করিবার অবসর পায়। এই মানবদেহেই মানুষ উন্নতিসাধনের বিশেষ সুযোগ পায়। এই মানবদেহকে কর্ম্মদেহ বলে, এই মানবদেহেই আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট স্থির করিয়া থাকি। আমরা একটী বৃহৎ বৃত্তাকারে ভ্রমণ করিতেছি, আর মানবদেহই সেই বৃত্তের মধ্যে এক বিন্দু, যথায় আমাদের ভবিষ্যৎ অবস্থা স্থির হয়। এই কারণেই অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার দেহ অপেক্ষা মানবদেহই শ্রেষ্ঠতম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। মানব দেবগণ হইতেও শ্রেষ্ঠতর। দেবগণও মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। দ্বৈত বেদান্ত এই পর্য্যন্ত বলেন।

তারপর বেদান্ত দর্শনের আর এক উচ্চতর ভাব আছে—তাহাতে বলে, এ সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণ সমীচীন নহে। যদি বলেন,

ঈশ্বরও অনন্ত, জীবাত্মাও অনন্ত এবং প্রকৃতিও অনন্ত, তবে এইরূপ অনন্তের সংখ্যা আপনি যত ইচ্ছা বাড়াইতে পারেন, কিন্তু এইরূপ অনেকগুলি অনন্ত কল্পনা করা যুক্তিবিরুদ্ধ ; কারণ, এই 'অনন্ত'গুলি পরস্পর পরস্পরের সঙ্কোচ করিয়া প্রত্যেককেই সসীম করিয়া তুলিবে, প্রকৃতপক্ষে অনন্ত বলিয়া কিছু থাকিবে না। অতএব ইঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ ; তিনি নিজের ভিতর হইতে এই জগৎ বাহির করিয়াছেন। ইহার অর্থ কি ঈশ্বরই এই দেয়াল, এই টেবিল, এই পশু, হত্যাকারী এবং জগতের অন্তর্গত আর আর মন্দ জিনিষ সব হইয়াছেন ? ঈশ্বর শুদ্ধস্বরূপ, তিনি কিরূপে এ সকল মন্দ জিনিষ হইতে পারেন ? ইঁহারা একথার উত্তরে বলেন, না, তিনি হন নাই। ঈশ্বর অপরিণামী, এ সকল পরিণাম প্রকৃতি-গত মাত্র—যেমন আমি আত্মা, অথচ আমার দেহ রহিয়াছে। এক অর্থে এই দেহ আমা হইতে পৃথক্ নহে, কিন্তু আমি, যথার্থ আমি কখনই দেহ নই। আমি কখন বালক, কখন যুবা, কখন বা বৃদ্ধ হইতেছি, কিন্তু উহাতে আমার আত্মার কিছুমাত্র পরি-বর্ত্তন হয় নাই। উহা সেই যে আত্মা, সেই আত্মাই থাকে। এইরূপ প্রকৃতি এবং অনন্ত আত্মা সমন্বিত এই জগৎ যেন ঈশ্ব-রের অনন্ত শরীরস্বরূপ। তিনি ইহার সর্ব্বাংশে ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছেন। তিনিই একমাত্র অপরিণামী, কিন্তু প্রকৃতি পরিণামী এবং আত্মাগণও পরিণামী। প্রকৃতির কিরূপ পরিণাম হয় ? প্রকৃতির রূপ বা আকার ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত

হইতেছে, উহা নূতন নূতন আকার গ্রহণ করিতেছে। কিন্তু আত্মসকল এইরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইতে পারে না। উহাদের কেবল জ্ঞানের সঙ্কোচ ও বিকাশ হয়। প্রত্যেক আত্মাই অশুভ কর্ম্ম দ্বারা সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয়। যে সকল কার্য্যের দ্বারা আত্মার স্বাভাবিক জ্ঞান ও পবিত্রতা সঙ্কুচিত হয়, তাহাদিগকেই অশুভ কর্ম্ম বলে। যে সকল কর্ম্ম আবার আত্মার স্বাভাবিক মহিমা প্রকাশ করিয়া দেয়, তাহাদিগকে শুভকর্ম্ম বলে। সকল আত্মাই শুদ্ধস্বভাব ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের নিজেদের কার্য্য দ্বারা তাঁহারা সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তথাপি ঈশ্বরের কৃপায় ও শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহারা আবার বিকাশপ্রাপ্ত হইবেন ও পুনরায় শুদ্ধস্বরূপ হইবেন। প্রত্যেক জীবাত্মার মুক্তিলাভের সমান সুযোগ ও সম্ভাবনা আছে এবং কালে সকলেই শুদ্ধস্বরূপ হইয়া প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও এই জগতের লোপ হইবে না, কারণ, উহা অনন্ত। ইহাই বেদান্তের দ্বিতীয় প্রকার সিদ্ধান্ত। প্রথমোক্তটীকে দ্বৈতবেদান্ত বলে; আর দ্বিতীয়োক্তটী—যাহার মতে ঈশ্বর, আত্মা ও প্রকৃতি আছেন, আর আত্মা ও প্রকৃতি ঈশ্বরের দেহস্বরূপ আর ঐ তিনে মিলিয়া এক—ইহাকে বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্ত বলে। আর এই মতাবলম্বিগণকে বিশিষ্টাদ্বৈতী বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলে।

সর্ব্বশেষ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মত অদ্বৈতবাদ। ইহারও মতে ঈশ্বর এই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ উভয়ই। সুতরাং ঈশ্বর

এই সমগ্র জগৎ হইয়াছেন। অদ্বৈতবাদী—"ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ আর জগৎ যেন তাঁহার দেহস্বরূপ আর সেই দেহের পরিণাম হইতেছে"—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, তবে আর ঈশ্বরকে এই জগতের উপাদান কারণ বলিবার কি প্রয়োজন? উপাদান কারণ অর্থে যে কারণটী কার্য্যরূপ ধারণ করিয়াছে। কার্য্য কারণের রূপান্তর বই আর কিছুই নহে। যেখানেই কার্য্য দেখা যায়, তথায়ই বুঝিতে হইবে, কারণই রূপান্তরিত হইয়া অবস্থান করিতেছে। যদি জগৎ কার্য্য হয়, আর ঈশ্বর কারণ হন, তবে এই জগৎ অবশ্যই ঈশ্বরের রূপান্তরমাত্র। যদি বলা হয়, জগৎ ঈশ্বরের শরীর, আর ঐ দেহ সঙ্কোচপ্রাপ্ত হইয়া সূক্ষ্মাকার ধারণ করিয়া কারণ হয় ও পরে আবার সেই কারণ হইতে জগতের বিকাশ হয়, তাহাতে অদ্বৈতবাদী বলেন, ঈশ্বর স্বয়ংই এই জগৎ হইয়াছেন। এক্ষণে একটী অতি সূক্ষ্ম প্রশ্ন আসিতেছে। যদি ঈশ্বর এই জগৎ হইয়া থাকেন, তবে সবই ঈশ্বর। অবশ্য, সবই ঈশ্বর। আমার দেহও ঈশ্বর, আমার মনও ঈশ্বর, আমার আত্মাও ঈশ্বর। তবে এত জীব কোথা হইতে আসিল? ঈশ্বর কি লক্ষ লক্ষ জীবরূপে বিভক্ত হইয়াছেন? সেই অনন্ত শক্তি, সেই অনন্ত পদার্থ, জগতের সেই এক সত্তা কিরূপে বিভক্ত হইতে পারেন? অনন্তকে বিভাগ করা অসম্ভব। তবে কিরূপে সেই শুদ্ধস্বরূপ এই জগৎ হইলেন? যদি তিনি জগৎ হইয়া থাকেন, তবে তিনি পরিণামী, আর পরিণামী হইলেই তিনি প্রকৃতির অন্তর্গত আর প্রকৃতির অন্তর্গত যাহা কিছু,

তাহারই জন্ম মরণ আছে। যদি ঈশ্বর পরিণামী হন, তবে তাঁহারও একদিন মৃত্যু হইবে। এইটী মনে রাখিবেন। আবার আর এক জিজ্ঞাস্য এই যে, ঈশ্বরের কতখানি এই জগৎ হইয়াছে? যদি বলেন, ঈশ্বরের 'ক' অংশ জগৎ হইয়াছে, তবে ঈশ্বর এক্ষণে ঈশ্বর—ক হইয়াছেন; অতএব স্থষ্টির পূর্ব্বে তিনি যে ঈশ্বর ছিলেন, এখন আর সে ঈশ্বর নাই। কারণ, তাঁহার ঐ অংশটী জগৎ হইয়াছে। ইহাতে অদ্বৈতবাদীর উত্তর এই যে, এই জগতের বাস্তবিক সত্তা নাই, উহা আছে, ইহা প্রতীয়মান হইতেছে মাত্র। এই দেবতা, স্বর্গ, জন্মমৃত্যু, অনন্তসংখ্যক আত্মা আসিতেছে যাইতেছে—এ সমুদয়ই কেবল স্বপ্নমাত্র। সমুদয়ই সেই এক অনন্তস্বরূপ। একই সূর্য্য বিবিধ জলবিন্দুতে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানারূপ দেখাইতেছে। লক্ষ লক্ষ জলকণাতে লক্ষ লক্ষ সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে আর প্রত্যেক জলকণাতেই সূর্য্যের সম্পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে; কিন্তু সূর্য্য প্রকৃতপক্ষে একটী। এই সকল জীবগণসম্বন্ধেও সেই কথা—তাহারা সেই এক অনন্ত পুরুষের প্রতিবিম্ব মাত্র। স্বপ্ন কখন সত্য ব্যতীত থাকিতে পারে না, আর সেই সত্য—সেই এক অনন্ত সত্তা। শরীর, মন বা আত্মা ভাবে ধরিলে আপনি স্বপ্নমাত্র, কিন্তু আপনার যথার্থস্বরূপ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। অদ্বৈতবাদী ইহাই বলেন। এই সব জন্ম, পুনর্জ্জন্ম, এই আসা যাওয়া—এ সব সেই স্বপ্নের অংশমাত্র। আপনি অনন্তস্বরূপ। আপনি আবার কোথায় যাইবেন? সূর্য্য, চন্দ্র এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আপনার যথার্থস্বরূপের

নিকট এক বিন্দুমাত্র। আপনার আবার জন্মমরণ কিরূপে হইবে? আত্মা কখন জন্মান নাই, কখন মরিবেনও না, আত্মার কোন কালে পিতামাতা শত্রু মিত্র কিছুই নাই; কারণ, আত্মা অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ।

অদ্বৈত বেদান্তের মতে মানবের চরম লক্ষ্য কি? এই জ্ঞান লাভ করা ও জগতের সহিত একত্বভাব প্রাপ্তি। যাঁহারা এই অবস্থা লাভ করেন, তাঁহাদের পক্ষে সমুদয় স্বর্গ, এমন কি, ব্রহ্ম-লোক পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়, এই সমুদয় স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায় আর তাঁহারা আপনাদিগকে জগতের নিত্য ঈশ্বর বলিয়া দেখিতে পান। তাঁহারা তাঁহাদের যথার্থ আমিত্বলাভ করেন—আমরা এক্ষণে যে ক্ষুদ্র অহংকে এত বড় একটা জিনিষ বলিয়া মনে করিতেছি, উহা তাহার অনন্তগুণ দূরে। আমিত্ব নষ্ট হইবে না—অনন্ত ও সনাতন আমিত্ব লাভ হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুতে সুখবোধ আর থাকিবে না। আমরা এক্ষণে এই ক্ষুদ্র দেহে, এই ক্ষুদ্র আমিকে লইয়া সুখ পাইতেছি। যখন সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড আমাদের নিজেদের দেহরূপে বোধ হইবে, তখন আমরা কত অধিক সুখ পাইব! এই পৃথক্ পৃথক্ দেহে যদি এত সুখ থাকে, তবে যখন সকল দেহ এক হইয়া যাইবে, তখন আরও কত অধিক সুখ! যে ব্যক্তি ইহা সাক্ষাৎ করিয়াছে, সেই মুক্তিলাভ করিয়াছে, এই স্বপ্ন কাটাইয়া তাহার পারে চলিয়া গিয়াছে, নিজের যথার্থ-স্বরূপ জানিয়াছে। অদ্বৈত বেদান্তের ইহাই উপদেশ।

বেদান্ত দর্শন এক একটী করিয়া এই তিনটী সোপান অব-

লম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছে আর আমরা ঐ তৃতীয় সোপানে অতিক্রম করিয়া আর অগ্রসর হইতে পারি না, কারণ, আমরা একত্বের উপর আর যাইতে পারি না। যাঁহা হইতে জগতের সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পূর্ণ, একস্বরূপের ধারণার বেশী আমরা আর যাইতে পারি না। সকল লোকে এই অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিতে পারে না; উহা তাহাদের পক্ষে বিশেষ কঠিন। প্রথমতঃ, বুদ্ধিবিচারের দ্বারা বুঝাই বিশেষ কঠিন। উহা বুঝিতে তীক্ষ্ণতম বুদ্ধির প্রয়োজন, অকুতোভয় বিচারশক্তির প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, উহা অধিকাংশ ব্যক্তিরই উপযোগী নহে।

এই তিনটী সোপানের মধ্যে প্রথমটী হইতে আরম্ভ করা ভাল। ঐ প্রথম সোপানটীর সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া বেশ করিয়া বুঝিলে দ্বিতীয়টী আপনিই খুলিয়া যাইবে। যেমন একটী জাতি ধীরে ধীরে উন্নতিসোপানে অগ্রসর হয়, ব্যক্তিকেও তদ্রূপ করিতে হয়। ধর্ম্মজ্ঞানের উচ্চতম চূড়ায় আরোহণ করিতে মানবজাতিকে যে সকল সোপান অবলম্বন করিতে হইয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তিকেও তাহাই অবলম্বন করিতে হইবে। কেবল প্রভেদ এই যে, সমগ্র মানবজাতিকেই এক সোপান হইতে সোপানান্তরে আরোহণ করিতে লক্ষ লক্ষ বর্ষ লাগিয়াছে, কিন্তু ব্যক্তিগণ কয়েক বর্ষের মধ্যেই মানবজাতির সমগ্র জীবন যাপন করিয়া লইতে পারেন, অথবা তাঁহারা আরো শীঘ্র, হয় ত ছয় মাসের মধ্যেই উহা সারিয়া লইতে পারেন। কিন্তু আমাদের প্রত্যেককেই এই সোপানগুলির মধ্য দিয়া যাইতে হইবে।